সচিত্র শিশু উপন্যাস নং ৩



# সোরাব-রুস্তাম

ঠাকুরমার ঝোলা, ঠাকুরদাদার ঝোলা প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্

কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩২৮

মূল্য এক টাকা

সচিত্র শিশু উপন্যাস নং ৩

# সোরাব-রুস্তাম

ঠাকুরমার ঝোলা, ঠাকুরদাদার ঝোলা প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীসত্যচরণ চক্রবর্ত্তী প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ

১৩২৮

মূল্য এক টাকা

রুস্তমের যুদ্ধ যাত্রা

# সোরাব-রুস্তাম



## প্রথম পরিচ্ছেদ

### ঘোড়া-চোর

আকাশের গায়ে সিন্দূর ছড়াইয়া অস্তগামী সূর্য্য "পামীর-পর্ব্বতমালার" পিছনে ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইতেছিলেন। সেই রক্তিমাভা নীচে ঠিক্‌রাইয়া পড়িয়া 'জিহুন'-নদীর জলে এবং তাহার উত্তর উপকূলের বনরাজিতে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। দলে দলে পশু পক্ষী সেই রক্তরাগে রঞ্জিত হইয়া ইতস্ততঃ খেলিয়া বেড়াইতেছিল, মাঝে মাঝে তাহাদের স্বাভাবিক আনন্দকলরব সমস্ত বনভূমি কাঁপাইয়া যেন ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া দিতেছিল। কোথাও মানুষের সাড়া-শব্দটী পর্য্যন্ত ছিল না।

একদল হরিণ নদীর ধারে জল খাইতে আসিয়া মুগ্ধের মত দাঁড়াইয়াছিল। গোটাকতক জলের ধারে নামিয়াছিল এবং অপরগুলি উপরে দাঁড়াইয়া মুখ উঁচু করিয়া ইতস্ততঃ আঘ্রাণ লইতেছিল। হঠাৎ অদূরে যেন কিসের শব্দ পাইয়া চকিত হইয়া উঠিল, এবং পর মুহূর্ত্তে—বিদ্যুদ্বেগে একটা তীর আসিতে দেখিয়াই যে চোখের পলকে কে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল

তাহার ঠিকানা রহিল না। কেবল একটা হরিণ তীরবিদ্ধ হইয়া সেইখানে পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্ত পরেই বনভূমি কাঁপাইয়া অশ্বপদধ্বনি উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত এক বিরাট দেহ, মহাবলবান্ যোদ্ধা তীরের মতই ঘোড়া ছুটাইয়া আসিয়া সেইখানে নামিলেন এবং ঘোড়ার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—'সাবাস্ রাক্স্ !"

'রাক্স্' যেন প্রভুর আদর বুঝিয়া, ঘাড় দোলাইয়া হ্রেষা ধ্বনি করিয়া উঠিল। যোদ্ধার মুখে ঈষৎ আনন্দের হাসি খেলিয়া গেল, হরিণটাকে অবলীলাক্রমে হাতে ঝুলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে বনের ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলেন। অশ্ব 'রাক্স্'—ঠিক যেন পোষা কুকুরের মত—সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

বনের ভিতরে এক স্থানে একটা সরু পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী উপলখণ্ডের উপর দিয়া তর তর করিয়া বহিয়া যাইতেছিল —জল কাচের মত স্বচ্ছ। তাহার উভয় তীরে বহুকালের প্রাচীন বৃক্ষসকল যেমন প্রহরীর মত নীরবে দাঁড়াইয়াছিল, তেমনি নীচেও নবশ্যাম তৃণদল যেন কোমল গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছিল। সেইখানে একটা পরিষ্কার গাছের তলায় হরিণটাকে রাখিয়া যোদ্ধা অশ্বের সাজ খুলিয়া দিয়া আবার তাহার পীঠ চাপড়াইয়া কহিলেন—

"তুমি আমার প্রধান বন্ধু—নিত্যসহচর, আগে তোমার সেবা করাই আমার কর্ত্তব্য, যাও 'রাক্স্', এখন নিশ্চিন্ত হইয়া মনের সুখে চরিয়া খাও।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। যোদ্ধা কতকগুলি শুষ্ক ডাল পালা সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং পাথরের গায়ে তীরের ফলা ঠুকিয়া অগ্নি প্রজ্বলিত করিলেন, তারপর হরিণের খানিকটা মাংস ছাড়াইয়া সেই আগুনে পোড়াইয়া খাইয়া নদীর জলে পিপাসা নিবারণ করিলেন।

তখন রাত্রি হইলেও অন্ধকার তেমন গাঢ় ছিল না—শুক্ল-পক্ষের ক্ষীণ চন্দ্র পশ্চিমাকাশে যে টুকু আলো দিতেছিল—তাহাই গাছের ফাঁকে ফাঁকে পড়িয়া বনভূমির তমসা অনেকখানি দূর করিয়া দিয়াছিল। ঘোড়াটাকে আর দেখা না গেলেও সেই প্রভুভক্ত জীব যে তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইবে না, তাহা যোদ্ধার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। ভ্রমণ ও শীকারের পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া তিনি সেই সশস্ত্র অবস্থাতেই গাছের তলায় শুইয়া পড়িলেন এবং অচিরেই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন হইলেন।

'রাক্স্' চরিতে চরিতে প্রভুর নিকট হইতে একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, হঠাৎ কিসের শব্দ পাইয়া, আহার বন্ধ করিয়া মুখ তুলিয়া চাহিল। যাহা দেখিল তাহাতে বোধ করি ব্যাপারটা বুঝিয়া লইতে তাহার বাকী থাকিল না, নির্ভীক প্রভুর নির্ভীক বাহন একবার গা ঝাড়িয়া হ্রেষাধ্বনি করিয়া সম্মুখের এক পা তুলিয়া বারম্বার মাটীতে আঘাত করিতে লাগিল।

অদূরে একটা গাছের আড়ালে গা ঢাকিয়া দাঁড়াইয়া জন কতক 'তুরাণী' শিকারী তাহার দিকে লক্ষ্য করিয়া একটা শক্ত

দড়ির ফাঁস প্রস্তুত করিতেছিল। একজন চাপা গলায় কহিল —"কিন্তু শুনিয়াছি যে, সমস্ত ইরাণ দেশের ভিতরেও এমন সুন্দর, প্রকাণ্ড ঘোড়া একমাত্র রুস্তাম ভিন্ন আর কাহারও নাই ; এ ঘোড়া আসিল কোথা হইতে ?"

আর একজন বিরক্তভাবে জবাব করিল—"যেখান হইতেই আসুক উহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে পারিলে শীকারে আসা সার্থক হইবে। আমাদের সামানগানের (সমরখণ্ড) কথা কি, সমস্ত 'তুরাণ' দেশে হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে। বাদশা 'আফ্রিয়াজাব' এ ঘোড়া পাইলে পঞ্চাশ হাজার আসরফি দিতেও কাতর হইবেন না।"

"আর যদিই 'রুস্তামের' ঘোড়া হয়, কোন গতিকে এখানে আসিয়া পড়িয়া থাকে ? তা হইলে যে সর্ব্বনাশ—"

"আরে রাখ তোর সর্ব্বনাশ, সমস্ত তুরাণ দেশের ভিতরে এমন ঘোড়া কেউ কখনও চোখেও দেখিয়াছে কি, ইহার বাচ্ছা হইলে দেশের একটা অমূল্য সম্পত্তি হইবে, এ রত্ন কি ছাড়া যায় ? আর যদিই রুস্তামের ঘোড়া কোন রূপে এদিকে আসিয়া পড়িয়া থাকে তাতেই বা কি, রুস্তাম কেমন করিয়া টের পাইবে যে আমরা তার ঘোড়া চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছি। এ রত্ন হাত করিতেই হইবে, একবার যো-সো করিয়া ফাঁসটা গলায় লাগাইতে পারিলে হয়।"

কিন্তু সে ফাঁস 'রাক্‌সের' গলায় দেওয়া সহজ হইল না। ঘোড়াচোরদের মতলব বুঝিয়াই যেন 'রাক্‌স্' এমন দুর্দ্দান্ত

হইয়া উঠিল যে, শুধুই দাঁত দিয়া সে ফাঁসের দড়ি টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়াই থামিল না। পিছন পায়ের ভীষণ আঘাতে দুই তিন জনকে একেবারে যমালয়ে পাঠাইল। কিন্তু হায়, চতুর মানুষের দুষ্ট বুদ্ধির কাছে সে কতক্ষণ টিকিবে। সারারাত প্রাণপণে বাধা দিয়া শেষে ভোরের বেলা ধরা পড়িয়া গেল এবং একটা আকাশভেদী তীব্র হ্রেষায় সেই বিপদবার্ত্তা নিদ্রিত প্রভুকে জানাইয়া, চোরদের দৃঢ় আকর্ষণে বাধ্য হইয়া পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল।

---

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

### রুস্তাম

'জিহুন' নদীর উত্তরে যেমন 'তুরাণ' দেশ, দক্ষিণেও তেমনি 'ইরাণ' দেশ খৃষ্টপূর্ব্ব ৬০০ শতাব্দীতে পৃথিবীতে দুইটি মহা প্রতাপশালী রাজ্য বলিয়া বিখ্যাত ছিল। এখনকার দিনে সেই 'জিহুন নদী—'আমুদরিয়া' এবং 'তুরাণ দেশ'—'তুর্কীস্থান ও 'ইরাণ প্রদেশ' যেমন 'পারস্য' নামে খ্যাত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তেমনি 'ইরাণ' ও 'তুরাণ' নামেই তাহাদের ঐশ্বর্য্য সম্পদ এবং শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য পৃথিবীর লোকের কাছে বিস্ময়, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু 'ইরাণ' ও 'তুরাণের' ভাগ্যে বিধাতা শান্তি লিখেন নাই। নদীর দুই ধারে সাম্‌না সাম্‌নি দুইটি রাজ্য পরস্পর

পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া একে অন্যের ধ্বংসের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। তাহার ফলে সর্ব্বদাই যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হইত, তাহাতে উভয় দেশবাসিগণেরই শান্তি নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিত। জিহুন নদী খুব প্রশস্ত হইলেও পার্ব্বত্য নদী বলিয়া, সকল সময়ে গভীর জল থাকিত না বরং একমাত্র বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে লোকে হাঁটিয়া পারাপার হইতে পারিত। সুতরাং তাহাতে বাধা না জন্মাইয়া ইরাণ ও তুরাণের কলহের সুবিধাই করিয়া দিত।

ইরাণের বাদশার অধীনে যেমন এক একটি প্রদেশ লইয়া এক একজন ছোট ছোট রাজা রাজত্ব করিতেন, তুরাণেও তেমনি অনেকগুলি ছোট খাট প্রাদেশিক রাজা ছিলেন। উভয় দেশের যুদ্ধের সময়ে এই সকল রাজারা নিজ নিজ সৈন্যসামন্ত লইয়া আপন আপন বাদশার সহায়তা করিতেন। তাহা ছাড়াও উভয় দেশেই অনেক বড় বড় বীর, যোদ্ধা, সাহসী ও শক্তিশালী পুরুষ, স্বাধীন ভাবে নিজ নিজ জায়গীর ভোগ করিয়া যুদ্ধকালে দেশরক্ষার জন্য যে যাহার নিজের বাদশার পক্ষ হইয়া প্রাণপাত করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজকর্ম্মচারী না হইলেও বাদশা হইতে দেশবাসী সকলের কাছেই ইঁহাদেরই প্রতিষ্ঠা, সম্মান ও শক্তি ছিল সব চেয়ে বেশী। যুদ্ধকালে বাদশাহেরা ইঁহাদিগকেই সসম্মানে আনাইয়া, যুদ্ধের সকল ভার তাঁহাদের উপর অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেন। এই সকল মহামান্য জায়গীরদারদের

ভিতরে কি ইরাণ, কি তুরাণ, কোন দেশেই রুস্তামের সমকক্ষ বীর ও যোদ্ধা আর কেহ ছিল না।

তখনকার দিনে তীর-ধনু, বল্লম-তলোয়ার, লাঠি-গদা প্রভৃতি অস্ত্রেই যুদ্ধ চলিত। কেহ কাহাকেও দ্বন্দ-যুদ্ধে আহ্বান করিলে সে যেমন তাহা উপেক্ষা করিতে পারিত না, তেমনি ন্যায় ও ধর্ম্ম ভাবিয়া উভয় দলের অন্যান্য যোদ্ধা ও সৈন্য-সামন্তগণ তাহাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করিত। সে যুদ্ধে যাহার জয় হইত তাহার পক্ষই জয়ী বলিয়া ঘোষিত হইত; অপর পক্ষ তখন পরাজয় স্বীকার করিয়া পলায়নপর হইত। সুতরাং উভয় দেশের লোকের কাছেই যে সেই মহাবীর, তুল্য সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়া, অন্য সকলের উপরে স্থান পাইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মহাবীর রুস্তামও তাঁহার অসামান্য শক্তি ও রণদক্ষতায় বহুবার শত্রু ধ্বংস করিয়া উভয় দেশের লোকের কাছেই তেমনি পূজনীয় ও সম্মানভাজন হইয়া উঠিয়া ছিলেন।

রুস্তামের বাস ইরাণ প্রদেশের রাজধানী 'সিস্তানের' কিছু দূরে 'জাবুলিস্থানে'। সেখানে তাঁহাদের বংশ উচ্চ ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া খ্যাত ছিল, তাঁহার বৃদ্ধ পিতা এবং ভ্রাতাও গৃহে বাস করিয়া রাজসম্মান প্রাপ্ত হইতেন। বীর ও যুদ্ধপণ্ডিত হইলেও, রুস্তাম তাঁহার পিতা ও ভ্রাতার মত নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে বাস করিতেন না। তাঁহার অদ্ভুত

বীর্য্য ও রণপাণ্ডিত্য দেখিয়া ইরাণের বাদশা 'কাইকুস্' তাঁহাকে সর্ব্বদাই দেশ-রক্ষার জন্য সসম্মানে আহ্বান করিয়া শত্রু-গণের বিপক্ষে যুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া রাখিতেন।

এইরূপে প্রবল পরাক্রান্ত আততায়িগণের কবল হইতে দেশ ও বাদশাকে বহুবার রক্ষা করিয়া বীর রুস্তাম 'কাইকুসকে' এমন ভাবে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছিলেন যে, কোন শত্রু আর রাজ্যলোভে ইরাণ আক্রমণ করিতে সাহস করিত না। কিন্তু এই বাদশাহ এমন দুর্ব্বলচিত্ত, অবিচারক ও অযোগ্য ছিলেন যে, প্রতিবাসী তুরাণীগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়া উঠিয়া এমন অশান্তি সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিল যে তাহাতে 'কাইকুস' সুস্থির থাকিতে পারেন নাই।

তুরাণের বাদশা 'আফ্রিয়াজাবের' সাহায্য করিবার জন্য রুস্তামের মত অদ্বিতীয় বীর যোদ্ধা কেহই ছিল না, তবুও তিনি 'কাইকুসের' আচরণে রাগিয়া যে যুদ্ধানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছিলেন তাহাতে দেশে অশান্তির অবধি ছিল না। বীরবর রুস্তাম বহুবার তুরাণীগণকে হারাইয়াও যুদ্ধানল একেবারে নিবাইতে পারেন নাই। শেষে প্রাণপাত চেষ্টা, বীরত্ব ও রণ-পাণ্ডিত্যে যখন তাহা নির্ব্বাণ করিয়া শান্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন তখনও—'কাইকুসের' আচরণ স্মরণ করিয়া তিনি ভাবিতেন যে এ শান্তি দেশের লোকের ভাগ্যে বেশী দিন স্থায়ী হইবে না।

দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তায় রুস্তামের হৃদয় পীড়িত ও মস্তিষ্ক এমন উত্তপ্ত হইয়া উঠিল যে, তিনি আর স্থির হইয়া থাকিতে পারিলেন না; মনোভার লাঘব করিবার জন্য একাকী অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া প্রিয় অশ্ব 'রাক্‌সে' চড়িয়া মৃগয়ায় যাত্রা করিলেন। রুস্তাম যেমন অদ্বিতীয় বীর তেমনি তাঁহার ঘোড়ারও জোড়া সারা ইরাণ কি তুরাণে কোথাও ছিল না। লোকে যেমন রুস্তামের পানে চাহিয়া বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া থাকিত, তেমনি তাঁহার 'রাক্‌স্‌কে' দেখিয়াও অবাক্ না হইয়া থাকিতে পারিত না। রুস্তাম ও রাক্‌স্‌ যে পরস্পর পরস্পরকে প্রাণের অধিক ভালবাসিত সে সম্বন্ধে বহু গল্প, দেশময় প্রচারিত হইয়া লোকের বিস্ময়ের মাত্রা শত গুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল।

তখন ইরাণ তুরাণ উভয় দেশে শান্তি বিরাজিত থাকিলেও কোন দেশের কোন লোকই বড় রকম দলবদ্ধ না হইয়া জিহুন পার হইয়া একে অন্যের দেশে যাইতে সাহস করিত না। তদ্ভিন্ন—কি ইরাণ, কি তুরাণ—জিহুন নদীর উভয় কূলেই ঘন বন ও পার্ব্বত্য উপত্যকায় মৃগয়ার পশু-পক্ষী এমন প্রচুর পরিমাণে মিলিত যে, কোন দেশের শিকারীর দলের আর সে জন্য অপরের দেশে যাইবার আবশ্যক হইত না।

'রাক্‌সে', চড়িয়া বীরবর রুস্তাম যখন মৃগয়ায় বাহির হইলেন, তখন পার্ব্বত্য পথে ও বনরাজির ভিতরে ঘুরিয়া

প্রকৃতির শোভা দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনের ভার যে কখন দূর হইয়া গেল—তা জানিতেও পারিলেন না। তাঁহার অন্তঃকরণ অপূর্ব্ব পুলকে ভরিয়া উঠিল, উৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া ক্রমেই অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

সম্মুখেই জিহুন নদী—শীর্ণ দেহ লইয়া উপলখণ্ডের উপরে অলসের মত পড়িয়া রহিয়াছে, ওপারে গভীর বনরাজি পাহাড়-শ্রেণীর কোলে পটে আঁকা ছবির মতই চিত্তাকর্ষক! রুস্তাম নদীতীরে আসিয়া ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া সেই সৌন্দর্য্যের পানে মুগ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। যতই দেখিতে লাগিলেন ততই পিপাসা বাড়িল। ওই অফুরন্ত সৌন্দর্য্যের অন্তরালে যে আরও কি অপূর্ব্ব রহস্য লুক্কায়িত আছে তাহা দেখিবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। নির্ভীক বীর অন্যমনে নদী পার হইয়া তুরাণের বনভূমিতে প্রবেশ করিলেন।

বেলা গড়াইয়া আসিয়াছিল, নানাপ্রকারের পশু মনের সুখে বিচরণ করিতেছিল—অশ্বপদশব্দে তাহারা চীৎকার করিয়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। কিন্তু রুস্তামের ভ্রমণের নেশা বাড়িল বই কমিল না—তিনি অশ্ব ছুটাইয়া চলিলেন। শেষে সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে দেখিয়া আহারের চিন্তার উদ্রেক হইল। শীকারের সন্ধানে নদীর দিকে ফিরিতেই যে হরিণের দল দৃষ্টি আকর্ষণ করিল তাহাতে লুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিলেন না, এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বেই একটাকে হত্যা করিয়া আহারের সংস্থান করিয়া লইলেন।

কিন্তু রুস্তামের আর ফিরিবার ইচ্ছা হইল না, বনভ্রমণের নেশা তাঁহাকে এমন মাতাইয়া তুলিয়াছিল যে সেই খানেই উপযুক্ত স্থান দেখিয়া লইয়া রাত্রের মত নিশ্চিন্ত হইয়া বিশ্রামে মন দিলেন।

---

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

### রাজ-গৃহে

অশ্বের হ্রেষায় চমকিয়া হঠাৎ যখন তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন ঊষার নবীন ছটা পূর্ব্বাকাশকে ঈষৎ উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল। চক্ষু রগড়াইয়া চাহিতে প্রথমেই ঘোড়ার সাজের উপর দৃষ্টি পড়িল। একি!—'রাক্‌স্' চরা করিয়া ফিরিয়া আসে নাই?

এই ঘোড়া এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, ঘরের বাহিরে গেলে সে তাহার প্রভুকে ছাড়িয়া একদণ্ডও তফাতে থাকিত না, তাড়াতাড়ি চরা শেষ করিয়া লইয়া, ঘুমন্ত প্রভুর কাছে আসিয়া, প্রহরীর মত চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত; রণে কি ভ্রমণে—কখনও কোথাও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। তবে আজ সে কোথায় গেল? রুস্তাম চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—"রাক্‌স্' 'রাকস্' শীঘ্র আইস।"

কিন্তু আসা দূরে থাকুক, রাক্‌স্ একটা শব্দ পর্য্যন্ত করিল না। রুস্তাম আশ্চর্য্য হইলেন। তাঁহার আহ্বানেও সে আসিল না—

এ ব্যাপার এমনি বিস্ময়কর যে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না—অশ্বের বিপদাশঙ্কায় অধীর হইয়া উঠিলেন। পুনঃ পুনঃ বন কাঁপাইয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন—"রাক্স্, রাক্স্!"

তখনও গাছের তলায়—ঝোপে-ঝাপে—অন্ধকার অস্পষ্ট হইয়া বিরাজ করিতেছিল। তাঁহার উচ্চ চীৎকার কানন কাঁপাইয়া প্রতিধ্বনি তুলিল। গাছের উপর পাখীরা কলরব করিয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু রাক্সের সাড়া-শব্দ আসিল না। তখন আর রুস্তামের মনে সন্দেহ রহিল না, অশ্বের যে কোন-রূপ বিপদ ঘটিয়াছে তাহা নিশ্চয় বুঝিয়া, তৎক্ষণাৎ অন্বেষণ করিতে চলিলেন।

ক্রমে আকাশ ফরসা হইল, বনের ভিতর আলোক-প্রবেশ করিল, রুস্তাম দেখিলেন একস্থানে কতকগুলি মনুষ্যপদচিহ্নের সঙ্গে ঘোড়ার পায়ের দাগ রহিয়াছে; দেখিয়া তিনি চমকিয়া দাঁড়াইলেন, ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন যে সেই পদ-চিহ্নগুলি বরাবর উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। তখন আর রুস্তামের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, তাঁহার নিদ্রিত অবস্থায় তুরাণীরা সেই বনে আসিয়া তাঁহার অশ্বকে যে কোন কৌশলেই হউক চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে। রুস্তামের আর ক্রোধের সীমা রহিল না—তিনি আর কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া তৎক্ষণাৎ সেই সকল পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া অশ্বের অন্বেষণে চলিলেন।

বনের বাহিরে আসিয়া পদচিহ্নগুলি যে দিকে অঙ্কিত হইতে হইতে ক্রমেই মিলাইয়া আসিতেছিল—সেইদিকে 'সামান গান'

( বর্ত্তমান সমরখণ্ড ) নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। সেখানে এক তুরাণী রাজা বাদশা 'আফ্রিজিয়াবের' অধীনে রাজত্ব করিতেন। ঘোড়াচোরেরা সেই দিকে গিয়াছে অনুমান করিয়া রুস্তাম 'সামানগান' অভিমুখে চলিলেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে সূর্য্য প্রখর হইতে লাগিল; রুস্তামও সামানগান নগরের প্রান্তসীমায় আসিয়া পড়িলেন। সেখানে রাজার প্রহরিগণ পথে পাহারা দিতেছিল, তাহারা দূর হইতে রুস্তামকে দেখিয়াই চিনিল এবং অশুভ আশঙ্কা করিয়া অতিদ্রুত রাজাকে সংবাদ দিতে ছুটিল।

মহাবীর রুস্তামের আকস্মিক আগমনসংবাদ শুনিয়া রাজা যেন একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন। তাঁহার বীরত্ব ও কার্য্যকলাপ জানিতে কাহারও বাকী ছিল না। যে রুস্তাম তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয় অশ্ব ছাড়া এক পা কোথাও যাইতেন না—তাঁহার পদব্রজে বহুদূর সামানগানে হাঁটিয়া আসার সংবাদ কিছুতেই শুভসূচক মনে করিতে পারিলেন না। আশঙ্কায় তাঁহারও মুখ শুকাইল—বুক কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে ভাব দমন করিয়া অতিথিবৎসল রাজা উপযুক্ত সমারোহে বীর-অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিতে তৎক্ষণাৎ বাহির হইবেন স্থির করিলেন, কিন্তু তখনকার দিনে বীরত্বের সম্মান ও সমাদর অধিক থাকিলেও সে অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীরকে তেমনভাবে পদব্রজে একাকী আসিতে শুনিয়া রাজা আর কিছুমাত্র জাঁকজমক প্রদর্শন করিতে পারিলেন না, তিনিও পদব্রজে একমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া অতিথিকে আহ্বান করিতে চলিলেন।

মধ্যপথেই রুস্তামের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়া গেল। বীরোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া বিনয়ের সহিত কহিলেন—

“মহাবীর রুস্তামের পদার্পণে আজ আমার দেশ ধন্য হইয়াছে। আমার বহু ভাগ্য যে গৃহদ্বারেই আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিলাম! আসুন—অনুগ্রহ করিয়া আমার গরীবখানায় পদধূলি দিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।”

রুস্তামেরও বীরের উপযোগী সৌজন্যের অভাব ছিল না, কিন্তু প্রাণাধিক রাক্‌স্‌কে হারাইয়া তখন তাঁহার হৃদয় ক্ষোভে ও দুঃখে অধীর হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ এই রাজারই ইঙ্গিতে তাঁহারই অনুচরের দ্বারা রাক্‌স্‌ অপহৃত হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার দর্শনে বীরের হৃদয় জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রত্যুত্তরে অসহিষ্ণুভাবে বলিয়া উঠিলেন—

“আমি আপনার আতিথ্যগ্রহণের ইচ্ছায় এখানে আসি নাই মহারাজ, আপনারই দেশের—আপনারই প্রজার দ্বারা আমার অশ্ব অপহৃত হইয়াছে—পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া তাহারই উদ্ধারে আসিয়াছি। আমার অশ্ব শীঘ্র আমাকে ফিরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করুন, খুসী হইয়া চলিয়া যাইতেছি, নচেৎ যে আগুন জ্বালিব তাহাতে শুধু যে সামানগানের শান্তি নষ্ট হইবে এমন নয়, সমস্ত তুরাণ প্রদেশ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যাইবে।”

রাক্‌স্‌ ঘোড়া যে রুস্তামের কিরূপ প্রাণাধিক প্রিয়, সে কথা কাহারও অবিদিত ছিল না। সুতরাং রুস্তামের আচরণে রাজা হৃদয়ে আঘাত পাইলেও মনে মনে অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না,

বরং হৃদয়বান্ নৃপতি তাঁহার অবস্থায় দুঃখিত হইয়া সহানুভূতি-সূচক বিনয়বচনে কহিলেন—

"আপনার অশ্ব অপহৃত হইয়াছে শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম এবং তাহা যে এই দেশের লোকের দ্বারাই হইয়াছে তজ্জন্য বড়ই অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইতেছি। কিন্তু আপনার দেশপ্রসিদ্ধ, অদ্বিতীয় বিজয়ী অশ্বকে যে কাহারও লুকাইয়া রাখিবার শক্তি হইবে না, তা আপনিও বুঝিতেছেন। অবিলম্বেই তাহার অনুসন্ধান মিলিবে। দয়া করিয়া আমার গরীবখানায় আসিয়া বিশ্রাম করুন, আমি এই দণ্ডেই তাহার অন্বেষণে চারিদিকে লোক পাঠাইতেছি। অপরাধীগণকে অশ্বের সহিত ধরিয়া আনিয়া আপনার হস্তেই অর্পণ করিব। তাহাদের বিচার আপনিই করিবেন।"

রাজার মহত্ত্ব ও সহৃদয়তা দেখিয়া রুস্তাম মনে মনে যেমন বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন—তেমনি নিজের সৌজন্যের অভাব স্মরণ করিয়া তাঁহার অনুতাপের সীমা রহিল না। লজ্জায় সারা মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সহসা উত্তর করিতে পারিলেন না—নতমুখে অপ্রস্তুতভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া কহিলেন—

"আসুন বীর, এরূপ দুর্ঘটনায় সকলেরই চিত্ত চঞ্চল ও রূঢ় হইয়া থাকে, সেজন্য লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমি বৃদ্ধ—আপনার পিতৃস্থানীয়, আমার কাছে আপনার কোন আচরণই অশোভনীয় নয়। এখন, দয়া করিয়া আসুন, পরিশ্রমে ও চিন্তায়

আপনি ক্লান্ত হইয়াছেন, আমার গরীবখানায় পদার্পণ করিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন ও আপনার শ্রান্তি দূর করুন।”

রুস্তাম আর আপত্তি করিতে পারিলেন না, রাজার সৌজন্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে রাজ-প্রাসাদে গমন করিলেন। সেখানে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য যে সকল আয়োজন প্রস্তুত ছিল, তাহাতে তিনি মনে মনে রাজার প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহার সাধুবাদ ও যশোগান না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। রাজাও আপন প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী ‘রাক্সের’ অন্বেষণের জন্য তৎক্ষণাৎ চারিদিকে অনুচর প্রেরণ করিলেন।

---

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

### তামিনা

সামানগানে রাজকুমারী ‘তামিনার’ মত পরম সুন্দরী ও ধর্ম্মশীলা মেয়ে সমস্ত তুরাণ দেশের ভিতরে আর ছিল না বলিলেও হয়। তাঁহার গৌরবে পিতামাতার গৌরব যেমন বাড়িয়াছিল, তেমনি একটা দুঃখ, একটা চিন্তা তীক্ষ্ণ সূচির মত নিরন্তর তাঁহাদের হৃদয়ে বিঁধিয়া বেদনা দিতেছিল। তামিনাকে কিছুতেই তাঁরা বিবাহে সম্মত করাইতে পারেন নাই।

এদিকে মেয়ের বিবাহের বয়স যতই উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছিল, ততই তাঁহার অসামান্য রূপ গুণের কথা শুনিয়া দলে দলে তুরাণের যত বীর, যোদ্ধা, রাজা ও রাজকুমারগণ নিয়ত

'সামানগান' রাজবাটীতে আসিয়া রাজার কাছে তাঁহার পাণি প্রার্থনা করিতেছিলেন। কিন্তু তামিনা যতই তাঁহাদিগকে নিরাশ করিয়া ফিরাইতেছিলেন, ততই যেন তাঁহাদের আনাগোনা আরও বাড়িয়া গেল। ক্রমে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে, সেই উপলক্ষ করিয়া দেশের ভিতরে একটা আত্ম-বিচ্ছেদের সূচনা জাগিয়া উঠিতে লাগিল। সেই জন্য রাজারাণীর ভাবনার অবধি না থাকিলেও বয়স্থা কন্যার অমতে জোর করিয়া বিবাহ দিয়া তাহাকে চির দুঃখভাগিনী করিতেও তাঁহাদের হৃদয়ে একটা গভীর বেদনা উঠিতেছিল। তেমনি দিনে ইরাণের মহাবীর রুস্তাম আসিয়া ঘটনাচক্রে রাজগৃহে অতিথি হইয়া রহিলেন।

রাজা তাঁহার অশ্বের অনুসন্ধানের জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইয়া নিয়ত চেষ্টা করিলেও, সন্ধান শীঘ্র মিলিল না। অশ্বের সন্ধান লইতে বিলম্ব হইতে লাগিল, রুস্তামকেও বাধ্য হইয়া সেখানে থাকিয়া যাইতে হইল।

রাজা তাঁহার অতিথির উপযোগী সমাদর ও সম্মানের ত্রুটি রাখেন নাই। একটি সুরম্য সুসজ্জিত কক্ষে তাঁহার স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া অনেকগুলি বান্দা-বাঁদী সুশ্রূষার জন্য নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাদেরই একজনকে নিভৃতে ডাকিয়া তামিনার প্রধান বাঁদী একদিন চুপি চুপি কহিল—

"আজ রাত্রে তোদের প্রভুর ঘরের পশ্চিমের দরজা খুলিয়া রাখিস্।"

রুস্তামের বাঁদী আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"হুকুম দেখাইতে পার ?"

"এই দেখ শাজাদীর পাঞ্জা, আজ রাত্রে তিনি পতির চরণ পূজিতে আসিবেন।"

"কে তাঁর পতি ?"

"জানিস্ না—তিনি যে বীরবর রুস্তামের বীরত্বের কাহিনীতে মুগ্ধ হইয়া বহুদিন হইতেই তাঁহাকে মনে মনে বরণ করিয়া রাখিয়াছেন, কেবল ভয়ে প্রকাশ করিতে পারেন নাই।"

"কেন, ভয় কিসের—এতো ভাল কথা।"

"কথা তো ভাল, কিন্তু ভয়ও তেমন খুবই ছিল। এতদিন ইরাণীরা আমাদের পরম শত্রু ছিল কি না—দুই দলে সর্ব্বদাই যুদ্ধ লাগিয়াই ছিল। তখন এ কথা প্রকাশ পাইলে কি রক্ষা থাকিত! বাদশার কাণে উঠিলে আমাদের রাজাকে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হইত। তাই এ কথা তিনি ঘুণাক্ষরেও কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। এখন উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া সে ভয় ঘুচিয়াছে বটে, কিন্তু রুস্তামের মনোভাব তো জানা নাই, যদি তিনি সম্মত না হন, তা' হইলে আগে হইতে মনোভাব প্রকাশ করিয়া শাজাদী কি কলঙ্কের বোঝা মাথায় করিয়া লইবেন ?"

"তবে যে বলিলি শাজাদী আসিবেন ?"

"দূর আহাম্মোক, শাজাদীর হইয়া আমাকেই গিয়া তাঁর মনোভাব আগে জানিতে হইবে। যদি সম্মত হন তা হইলে

আমার কথায় বিশ্বাস হইবে না বলিয়া শাজাদী একবার মাত্র বিদ্যুতের মত দ্বারদেশে চকিতে দেখা দিয়াই সরিয়া যাইবেন। আমি রাজার কাছে রুস্তামকে বিবাহের প্রস্তাব করিবার জন্য অনুরোধ করিব।”

রুস্তামের বাঁদী একটুখানি কি ভাবিয়া কহিল—

“ওঃ, বুঝিলাম—এই জন্যই দেশের এত বড় বড় লোককে শাজাদী নিরাশ করিয়া ফিরাইয়া দিতেছেন। কিন্তু রুস্তাম কি এ কথা জানেন না ?”

“কেমন করিয়া জানিবেন ? শাজাদীর মনের কথা এতদিন মনেই চাপা ছিল—আমিই সর্ব্বপ্রথম আজ শুনিয়াছি, আর এই তুই শুনিলি।”

“কিন্তু রুস্তাম যদি রাজী না হন ?”

“সেই জন্যই তো আমি তাঁর মন বুঝিতে আসিব। যদি রাজী হন মঙ্গল, না হন তো আমাদের শাজাদীর বরাতে বড় দুঃখ আছে, তিনি ফকিরী লইয়া মক্কায় চলিয়া যাইবেন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

রুস্তামের বাঁদী একেবারে যেন আকাশ হইতে পড়িল —ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—

“রাজী না হন—রুস্তাম ছাড়া কি আর অন্য মানুষ নাই, কত বড় বড়—”

বাধা দিয়া শাজাদীর বাঁদী গম্ভীর ভাবে কহিল—

"এ কি তোর আমার কথা রে পোড়ারমুখী, সতী নারীর কথাই আলাদা। তাঁরা হাসিতে হাসিতে প্রাণ দিতে পারেন—কঠোর দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যাঁহাকে মনে মনে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভুলিয়া অন্যের কথা মুহূর্ত্তের জন্যও মনে ভাবিয়া দ্বিচারিণী হইতে পারেন না। রুস্তাম যদি শাজাদীকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হন, তা' হইলে বেচারার—এক মৃত্যু ভিন্ন—আর কোন গতি নাই।" বলিয়া শাজাদীর বাঁদী চলিয়া গেল।

---

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ

### বিবাহ

গভীর রজনী—সমস্ত রাজধানী নিদ্রার কোলে অচেতন হইয়া মরার মত পড়িয়া আছে, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, পশুপক্ষী পর্য্যন্ত নিস্তব্ধ। কেবল মাঝে মাঝে ঝিল্লির রব আর বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ দূর হইতে প্রেতের নিশ্বাসের মত ভাসিয়া আসিতেছে।

সামানগানের রাজপ্রাসাদও ঘুমের কোলে একেবারে নিসাড়—স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। রুস্তাম আপন কক্ষে শয়ন করিয়া প্রায় মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত নানা চিন্তায় কাটাইয়া দিয়া সেই সবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন।

হঠাৎ কক্ষের পশ্চিমের দরজা নিঃশব্দে খুলিয়া গেল

এবং ততোধিক নিঃশব্দে এক কৃষ্ণকায় রমণী ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পদতলে দাঁড়াইল। মাথার কাছে দীপালোকে তাঁহার ঘুমন্ত মুখখানি ঢলঢল করিতেছিল, নিশ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে সুগঠিত বিশাল বক্ষস্থল তালে তালে নাচিতেছিল। রমণী অবাক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

ঘুমের ঘোরে রুস্তামের মুখ উজ্জ্বল হইয়া হঠাৎ বিদ্যুতের মত একটুখানি ক্ষীণ হাসি চকিতে অধর প্রান্তে মিলাইয়া গেল। রমণী বুঝিলেন—বীর কোন বীরত্বের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন।

সত্যই রুস্তাম স্বপ্ন দেখিতেছিলেন কিন্তু বীরত্বের নয়। তিনি যেন বাহুবলে এক অপরিচিত মনোহর রাজ্য জয় করিয়া সেইখানে কুসুম কাননে ভ্রমণ করিতেছিলেন। চারিদিকে ফুলের মেলা—সৌন্দর্য্যের খেলা পড়িয়া গিয়াছিল। ফুলের গন্ধে প্রাণে যেমন একটু মত্ততার আবেশ আনিয়া দিতেছিল, বাতাসে তেমনি যেন কোন্ নূতন জীবনের সাড়া আনিয়া চারিদিকের জড় প্রকৃতির বুকেও প্রাণসঞ্চার করিয়া দিতেছিল। রুস্তাম মুগ্ধ হৃদয়ে বেড়াইতে বেড়াইতে উপর পানে চাহিলেন।

সেখানেও মেঘে মেঘে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি! নানা বর্ণের বিচিত্র মেঘগুলি এ উহার গায়ে পড়িয়া আমোদে ঢলাঢলি করিতেছিল। হঠাৎ যেন কোন কুহকবলে মেঘগুলি ঠিক সমানভাবে দুই পাশে সরিয়া গেল। মাঝখানে সূর্য্য-রশ্মির মত ঝক্‌ঝকে সোণার প্রাঙ্গণে একখানি ততোধিক

উজ্জ্বল সোণার সিংহাসন চক্‌চক্‌ করিয়া উঠিল। সেই সিংহাসন হইতে নামিয়া এক স্বর্ণকান্তি দেবী ফুলের মত এক দেবশিশুকে কোলে লইয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

রুস্তাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, শিশুর অমল হাস্যের প্রবল আকর্ষণে অধীর হইয়া তাড়াতাড়ি দুই হাত-বাড়াইয়া আবেগভরে কোলে লইতে ছুটিলেন। অমনি যেন তাঁহার পদতলের মাটী সহসা ভূমিকম্পে কাঁপিয়া উঠিল, আকাশে, বাতাসে খল খল অট্টহাস্য ছুটিল। চারিদিক হইতে 'মার-মার' শব্দে অসংখ্য কৃষ্ণকায় দৈত্য ছুটিয়া আসিল, রুস্তাম অস্ত্র তুলিয়া বাধা দিতে না দিতে তাহারা দেবীর কোল হইতে শিশুকে কাড়িয়া লইল, দেবী মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে লুটাইলেন। রুস্তাম প্রচণ্ড তরবারির আঘাতে দৈত্যকে বিনাশ করিতে গিয়া যেন কোন্‌ অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে শিশুর শিরেই তরবারি হানিলেন, ফুলের শিশু চোখের পলকে দ্বিখণ্ডিত হইয়া ধরায় লুটাইল, ফোয়ারার মত তপ্ত রক্তধারা ছুটিয়া রুস্তামের সর্ব্বাঙ্গ লাল করিয়া দিল।

রুস্তাম অস্ফুট চীৎকার করিয়া শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ঘামে তাঁহার শয্যা অবধি সিক্ত হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া স্বেদধারা শ্রাবণের ধারার মত ঝরিতেছিল। রুস্তাম দুইহাতে চোখ রগ্‌ড়াইয়া গা মুছিবার জন্য উঠিয়া বসিলেন, অমনি পদতলে দণ্ডায়মানা কৃষ্ণকায় রমণীর উপর চক্ষু পড়িল। তিনি শিহরিয়া

মূঢ়ের মত মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া রহিলেন, তারপর প্রশ্ন করিলেন—
"কে তুই ?"

"হুজুরের বাঁদী।"

"এখানে কি চাহিস্ ?"

"এক আরজি লইয়া আসিয়াছি।"

"কার আরজি ?"

"শাজাদী-রাজকন্যা তামিনার।"

"শয়তানি, তোর প্রাণের ভয় নাই ?"

বলিয়া রুস্তাম কট্‌মট্ করিয়া চাহিয়া যেন বিদ্যুৎ বর্ষণ করিলেন, কিন্তু বাঁদী কিছুমাত্র ভীত না হইয়া দৃঢ়স্বরে জবাব করিল—

"সতী পত্নীকে যে গ্রহণ না করিয়া নিরন্তর মর্ম্মজ্বালা প্রদান করে, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর হইলেও আমি তাহাকে মানুষের মধ্যে গণনা করি না।"

বাঁদীর এই দুঃসাহসিক জবাব শুনিয়া এবং তাহার অটল অকম্পিত ভাব দেখিয়া রুস্তাম আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন, ক্ষণকাল মুখ দিয়া কথা সরিল না, তারপরে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত কোমল ভাবে প্রশ্ন করিলেন—

"কার পত্নী—কে দুঃখ দিতেছে ?"

"জোনাবালি হুজুরেরই—হুজুরই তাঁহাকে অশেষ দুঃখ দিতেছেন।"

রুস্তাম গভীর বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

বাঁদী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া একটুখানি কাছে সরিয়া আসিয়া চাপা গলায় কহিল—

"শাজাদী তামিনা বহুদিন হইতে হুজুরকেই মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়া আপনার অনুগ্রহের প্রত্যাশাতেই অশেষ দুঃখ নীরবে সহ্য করিতেছেন। তাঁহার বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে তবুও এদেশের বিবাহার্থী শত শত রাজা, রাজপুত্র ও বীরগণকে নিয়ত প্রত্যাখ্যান করিয়া আপনার ধ্যান লইয়াই বসিয়া আছেন। কেহ মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মুখদর্শনের সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারে নাই। সে জন্য রাজারাণীও অত্যন্ত চিন্তিত—এই লইয়া কে জানে কখন গৃহ-বিবাদ বাধিয়া উঠে? কিন্তু শাজাদীর মনের অভিপ্রায় অবগত নহেন বলিয়া তাঁহারা কোন উপায় করিতে পারিতেছেন না। হুজুর রাজার কাছে প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করুন, এমন সতী-পত্নীকে এরূপ মনঃপীড়া দিতেছেন কেন?"

রুস্তাম যাহা শুনিলেন তাহাতে নিজের শ্রবণকে বিশ্বাস হইল না, তখনো যেন সেই স্বপ্নের প্রভাব চলিতেছে বলিয়া মনে হইল, তিনি বারম্বার চক্ষু রগড়াইয়া বাঁদীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। বাঁদী তাঁহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া কহিল—"অবিশ্বাস করিবেন না, এই দেখুন তাঁর পাঞ্জা।"

"ও তুই চুরি করিয়া আনিয়াছিস্।"

"তবে আরও প্রত্যক্ষ দেখিতে চান—ওই দেখুন!"

বাঁদী যে দরজা দিয়া ঘরে ঢুকিয়াছিল সেই দিকে দেখাইয়া

দিল। রুস্তাম ঠিক যেন স্বপ্নাবিষ্টের মত চাহিয়াই স্তব্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার মনে হইল যে ক্ষণপূর্ব্বের সেই স্বপ্নে দৃষ্ট দেবী তাঁহারই পালঙ্ক সমীপে যেন চকিত বিদ্যুতের মত আপনার আবির্ভাব জানাইয়াই অদৃশ্য হইয়া গেলেন। বাঁদী উৎসাহিত হইয়া কহিল—

"দেখিলেন হুজুর—আমার কথা মিথ্যা নয়, যতশীঘ্র সম্ভব রাজার কাছে শাজাদীর পাণি প্রার্থনা করিয়া সতী-পত্নীকে রক্ষা করুন।"

রুস্তামের আর সংশয় রহিল না, যতই ভাবিতে লাগিলেন ততই বাঁদীর কথা ক্ষুরের মত তীক্ষ্ণ ধারে তাঁহার হৃদয় কাটিয়া কাটিয়া মর্ম্মস্থলে গিয়া বসিতে লাগিল, কাণে কেবল বাজিতে লাগিল—

'সতী-পত্নীকে উদ্ধার করুন।'

রুস্তাম আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, রাজার কাছে, রাজকুমারীর পাণি প্রার্থনা করিলেন। রাজা মনে মনে আনন্দিত হইলেও কহিলেন—

"এই সর্ত্তে আপনার সঙ্গে তামিনার বিবাহ দিতে পারি যদি ভবিষ্যতে আবার কখনো ইরাণে ও তুরাণে বিরোধ উপস্থিত হয়—আমার কন্যাকে এখানে রাখিয়াই আপনাকে একা দেশে যাইতে হইবে এবং তাহাকে আর কখনো সেখানে লইয়া যাইবার দাবী করিতে পারিবেন না। কিন্তু আগে তামিনার মত চাই।"

রুস্তাম সম্মত হইয়া কহিলেন—

"বেশ, আপনার কন্যা সম্মত হইলে, সর্ত্তে অঙ্গীকার করিলাম।"

রাজা সন্তুষ্ট হইলেন এবং যখন তামিনার সম্মতি জানিতে পারিলেন তখন আর বিলম্ব করিলেন না। সামানগানবাসীর আনন্দ-কোলাহলের ভিতরে রুস্তাম ও তামিনার বিবাহ হইয়া গেল। সেই উৎসবের ভিতরে ঈশ্বর প্রেরিত শুভাশীষের মত রুস্তামের রাকস্‌ও রাজকর্ম্মচারিগণের বিপুল চেষ্টায় মুক্তি পাইয়া প্রভুর নিকটে ফিরিয়া আসিয়া আনন্দোচ্ছ্বাস দশগুণ বাড়াইয়া দিল।

---

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কিন্তু হায়, নবদম্পতীর ভাগ্যে সে আনন্দ—সে সুখ অধিক কাল টিকিল না। রুস্তাম ইরাণ পরিত্যাগ করিবার পর হইতে বাদশা 'কাইকুশের' খাম্‌খেয়ালী এবং অত্যাচার নিত্যই বাড়িতে লাগিল। তাহার ফলে যে অচিরেই আবার ইরাণ ও তুরাণে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিবে তাহা দেশবাসীরা অনুমানে বুঝিয়া বাদশার নিকটে গিয়া দেশের শান্তি রক্ষার জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করিতে ছাড়িল না। কিন্তু কিছুতেই ফল হইল না।

বাদশা 'কাইকুশ' যা একটু ভয় বা গ্রাহ্য করিতেন তা—একমাত্র রুস্তামকে। রুস্তাম যতদিন স্বদেশে ছিলেন ততদিন সাবধানে সাবধানে সামলাইয়া থাকিয়া তিনি যেন হাঁফাইয়া উঠিয়াছিলেন। রুস্তামের বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন আরামে

হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন এবং পূর্ব্বের স্বভাব অনুযায়ী যথেচ্ছ আচরণ ও অত্যাচার-উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিলেন। রুস্তামের বিদায়ের কিছুদিন পরে ব্যাপার এমন হইয়া উঠিল যে দেশবাসী আবার ভাবী অশান্তির আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারিল না।

ফলে ঘটিলও তাই। ইরাণ ও তুরাণের মধ্যে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইয়া শান্তি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা যখন একদল অসম্মান ও অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইয়া দিল, তখন অপর দলই বা নিশ্চেষ্ট থাকিবে কেন? দেখিতে দেখিতে আবার উভয় দলে ছোট-খাট দাঙ্গা-হাঙ্গামা স্থুরু হইয়া ক্রমে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল। চারিদিকে রণডঙ্কা বাজিতে লাগিল, দেশময় হৈ হৈ পড়িয়া গেল।

এত শীঘ্র আবার এমন যে হইবে নবদম্পতী তা স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহারা মনের সুখে নিশ্চিন্ত হইয়া কাল কাটাইতেছিলেন, এমন সময় যুদ্ধের আহ্বান শুনিয়া রুস্তাম কহিলেন—

"আবার দেশে যুদ্ধ বাধিয়াছে তামিনা, আমি তো আর এখানে এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিতে পারি না, দেশের কাযে প্রাণ উৎসর্গ করিতে চলিলাম, বিদায় দাও।"

রুস্তামকে বিদায় দিতে তামিনার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, প্রাণ নিয়ত কাঁদিয়া উঠিতে লাগিল তবুও বীর-রমণী পতিকে যুদ্ধে গমনে বাধা দিতে পারিলেন না। রুস্তাম দুঃখিত স্বরে কহিলেন—

"একটা বৎসরও যে তোমার কাছে থাকিতে পাইব না, এত শীঘ্র আবার দেশে অশান্তির আগুণ জ্বলিয়া উঠিবে, একথা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমার এতকালের বিরাট রণশ্রম সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল—মূর্খ 'কাইকুসের' নির্ব্বুদ্ধিতা ও অত্যাচারই যে আবার যুদ্ধানল জ্বালিয়া দিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, আমি এতকাল প্রাণপাত করিয়াও দেশে নিরবচ্ছিন্ন শান্তি স্থাপন করিতে পারিলাম না। হতভাগ্য 'কাইকুসের' স্বপক্ষ হইয়া অস্ত্রধারণ করিতে আর ইচ্ছা হয় না, কিন্তু দেশের আহ্বান অবহেলা করিতে পারি না। দেশ যখন বিপন্ন তখন আপনার মান-অপমান, অভিযোগ-অনুযোগ ও স্বার্থ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়া ছুটিয়া যাইতেই হইবে, নহিলে আর মনুষ্যত্ব কি ?"

তামিনা গদ গদ স্বরে জবাব করিলেন—

"নিশ্চয়—নিশ্চয় প্রভু, এই তো তোমার মত বীরের উপযুক্ত কথা! যাও প্রভু, দেশ-মাতা ডাকিয়াছেন, আর আমার তোমাকে ধরিয়া রাখিবার অধিকার নাই। আর বাধা দিব না—এই আমি চোখের জল মুছিলাম, এ দাসী চিরকাল তোমার চরণ স্মরণ করিয়া—তোমার নাম জপ করিয়াই জীবন কাটাইবে।"

বলিতে বলিতে বিরাট পতি-গর্ব্বে তামিনার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, রুস্তাম পত্নীর মুখের পানে চাহিয়া মর্ম্ম বেদনায় কাতর স্বরে কহিলেন—

"হায় তামিনা, যদি দেশে শান্তি থাকিত তা হইলে আর আমাকে তোমায় ছাড়িয়া যাইতে হইত না। কিন্তু বিধাতার

বিধান—তা হইবার নয়। আবার যে ভবিষ্যতে কখনও শান্তি স্থাপিত হইবে—সে আশাও, এ বাদশা বর্ত্তমান থাকিতে আর নাই। সুতরাং এ জীবনে আর কখনো যে তোমাকে দেখিতে পাইব সে দূরাশা করিতে পারি না। তবু, তোমার যে সন্তান জন্মিবে তাহার মুখ দেখিয়া তুমি প্রাণ বাঁধিয়া থাকিতে পারিবে, কিন্তু আমার সান্ত্বনা কোথায়? আমি কি তাহার চাঁদমুখখানি এ জীবনে একটি বারের জন্যও কখন চোখে দেখিতে পাইব—হায়রে দুর্ভাগ্য! কিন্তু তবুও যাইতেই হইবে, দেশের কায—আর বিলম্ব করিতে পারি না।”

বলিয়া রুস্তাম চোখের জল মুছিয়া নিজের বাহুমূল হইতে একটি মূল্যবান্ পদক বাহির করিয়া তামিনার হাতে দিয়া আবার কহিলেন—

“এই লও তামিনা, এটি আমাদের বংশের মহামূল্য পরম দুর্ল্লভ বস্তু, ইহার পশ্চাতে আমার নাম ও বংশপরিচয় খোদিত আছে। এই পদকের আশ্চর্য্য গুণ,—যাহার নিকটে থাকিবে তাহাকে সুখ, সৌভাগ্য ও সুযশে পূর্ণ করিয়া দিবে। যদি আমাদের একটি কন্যা হয়—তবে তাহার গলায় এই পদক পরাইয়া দিও, সে পরম ধর্ম্মশীলা আদর্শ রমণীরত্ন হইয়া পৃথিবীতে পরম সুখী হইবে। আর—আর যদি ঈশ্বরের দয়ায় আমাদের পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে, তবে এই পদক তার দক্ষিণ বাহুমূলে বাঁধিয়া দিও, সে পৃথিবীতে পরম গুণবান্, মহচ্চরিত্র, অসীম শক্তিশালী বীর হইয়া উঠিবে, তাহার যশে ও গৌরবে পৃথিবী ভরিয়া যাইবে।”

বলিয়া পদকটি তামিনার হাতে দিয়া, রুস্তাম শেষ বিদায় লইয়া চিরদিনের মত প্রস্থান করিলেন। পতির অদর্শনে সতী ধূলায় লুটাইয়া, পাগলিনীর মত কাঁদিতে লাগিলেন। পিতা, মাতা, আত্মীয়, বন্ধু কেহই বুঝাইয়া তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিল না। অবশেষে তাঁহার প্রধান বাঁদী আসিয়া কহিল—

"শাজাদি—এ করিতেছেন কি, গর্ভে যে ননীর পুতুল আসিয়াছে—এমন করিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করিবেন না।"

তামিনা চমকাইয়া উঠিলেন—পতির কথা মনে পড়িয়া গেল। সন্তানের চাঁদমুখ দেখিবার আশায় বুক বাঁধিয়া আত্মসম্বরণ করিলেন।

অবশেষে তিন চার মাসের ভিতরেই শুভদিনে বিধাতা তাঁহার কোলে একটি পুত্রসন্তান দিলেন। তখন সেই ফুলের মত পবিত্র ও সুন্দর পুত্রমুখ দেখিয়া জননীর সকল বেদনা জুড়াইয়া গেল। যথারীতি জাতকর্ম্ম সকল সমাধা হইয়া শিশুর নামকরণ হইল—সোরাব!

---

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

### সোরাব

রুস্তাম যথার্থ অনুমান করিয়াছিলেন। সেই যে আবার ইরাণ ও তুরাণে সমরানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তাহা আর নিবিল না। বৎসরের পর বৎসর কাটিয়া যাইতে লাগিল তবুও

আর শান্তির চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উভয় দেশের শত্রুতা যেন আরও দৃঢ়মূল হইয়া বসিতে লাগিল। সুতরাং রুস্তামও আর পত্নীর সহিত মিলিত হইবার সুযোগ পাইলেন না, তামিনার মনেও তেমন আশা জাগিতে পাইল না। তিনি সেই একমাত্র নয়নপুতলি পুত্রের মুখ চাহিয়াই কাল কাটাইতে লাগিলেন।

সোরাব বড় হইয়াছিল। শৈশবে যে রূপের রাশি লইয়া সে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল—বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহা দশগুণ বাড়িয়া উজ্জ্বল ছটায়—দেশে প্রকাশিত হইয়া প্রবল আকর্ষণে সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। শৈশব হইতেই বালকের প্রকৃতিতে ঠিক পিতার মত যে সকল গুণের আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সে সমস্ত কিশোরেই পুষ্ট হইয়া তাহাকে সৌম্য, বীর্য্য ও পরাক্রমে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া দিয়াছিল। মাতার সুশিক্ষায় তাহার হৃদয় দেবতার মত উদার—তাহার চরিত্র পবিত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতে দেশের লোক বিস্ময়পরিপূর্ণ চক্ষে চাহিয়া সোরাবের প্রশংসাবাদ করিত আর জননীর হৃদয়ে অমনি একটা সুখের উৎস উথলিয়া উঠিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আশঙ্কা নিরন্তর তাঁহাকে বেদনা দিত।

উপযুক্ত পুত্রলাভ করিয়া, তাহার স্নেহে ও লোভে আকৃষ্ট হইয়া পতি পাছে পুত্রের শিক্ষার জন্য তাহাকে আপন পথের পথী করেন, সেই ভয়ে তামিনা রুস্তামকে সোরাবের সংবাদ অবধি দিতে সাহস করেন নাই। কন্যা সন্তান জন্মিয়াছে বলিয়া

তাঁহার কাছে কৌশলে মিথ্যা সমাচার প্রচার করিয়া দিয়া, অত্যন্ত সাবধানে বুকের ধনটিকে সঙ্গোপনে বুকে রাখিয়াই মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফলে তাঁহার ক্ষুদ্র বুকে যখন আর তাহার স্থান সঙ্কুলান হইল না, মর্ত্ত্যের সকল গৌরবে বিভূষিত হইয়া সে সন্তান আপনা হইতেই ধরণীর কোলে নামিয়া পড়িল, তখন তাঁহার ভয়-ভাবনার আর অন্ত রহিল না।

দেশে যুদ্ধের অবস্থা দিন দিন যেরূপ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইতেছিল, তাহাতে—তরুণবয়স্ক হইলেও—সোরাবের শৌর্য্য-বীর্য্য, পরাক্রম ও রণশিক্ষার কথা যখন বাদশার অবিদিত থাকিবে না, তখন তিনি যে তাহাকে মাতৃ-অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইয়া দেশের কার্য্যে নিয়োগ করিবেন না—এমন আশা তামিনা করিতে পারিতেন না, তখন সোরাবকে যে বাদশা কাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে পাঠাইবেন—তাহা ভাবিয়া তিনি মনে মনে আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন। তাহা ছাড়া আরও একটা গুরুতর চিন্তার হেতু দাঁড়াইয়াছিল। সোরাব যে কাহার পুত্র, সে কথা যদি একবার বাদশা জানিতে পারেন, তা' হইলে সেই দেশের গৌরব তরুণ যুবককে মনে মনে শত্রু ভাবিয়া—তাহার অনিষ্ট কামনায়—না জানি কি কূটচক্রের অবতারণা করেন এই সন্দেহে তাঁহার মাতৃহৃদয় ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া যাইত। আর সেই জন্যই তিনি শুধু যে সোরাবকে পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন এমন নয়, কৌশলে তাঁহার দেশের প্রজাপুঞ্জকেও এমন করিয়া লইয়াছিলেন যে, তাহারা ভুলিয়াও কখনো কাহারও কাছে

"বাবারে, তুমি ভুবনবিখ্যাত মহাবীর রুস্তামের পুত্র"—৩৩ পৃষ্ঠা

সোবারের প্রকৃত পিতৃ-পরিচয় ব্যক্ত করিত না। ‘সামানগান-বাসীরা সোরাবকে এমন প্রাণতুল্য ভালবাসিত যে—যাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র অপকার ঘটিবার সম্ভাবনা—তেমন কল্পনা মনেও স্থান দিতে পারিত না।

কিন্তু তামিনার সাগ্রহ আকিঞ্চন এবং হিতাকাঙ্ক্ষী দেশবাসি-গণের শত চেষ্টাও বাদশার নিকট হইতে সোরাবের পিতৃ-পরিচয় গুপ্ত রাখিতে পারে নাই। এমন কি সোরাব যে কিশোরকালেই পিতৃ-সদৃশ অদ্বিতীয় বীর হইয়া উঠিয়াছে এ সংবাদও বাদশার অবিদিত রহে নাই। তখন পিতাপুত্রের মিলন ভয়ে কাঁপিয়া এবং ঈর্ষা ও বিদ্বেষে জ্বলিয়া তিনি যখন মনে মনে এক ঢিলে দুই পাখী মারিবার কূট কৌশলজাল বিস্তার করিবার উপায় স্থির করিতেছিলেন, তেমনি দিনে সহসা একদিন সোরাব আসিয়া এমন ভাবে মাতার কাছে আপনার পিতৃ-পরিচয় জানিতে চাহিল যে, তামিনা আর তাহা গোপন রাখিতে পারিলেন না। মনে মনে আশঙ্কার উদয় হইলেও পতি-গর্ব্বে মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, আবেগভরে কহিলেন—

“বাবারে, তুমি ভুবনবিখ্যাত মহাবীর রুস্তামের পুত্র—ইরাণ প্রদেশের এক মহা সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর।”

রুস্তামের বীরত্ব কাহিনী সোরাব দেশবাসীর মুখে নিরন্তর শুনিয়া শুনিয়া মনে মনে শ্রদ্ধাও ভক্তিতে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল, এবং তেমনি মহাবীর ও দেশবিখ্যাত রণপণ্ডিত হইবার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া, সেই

বয়সেই যে মহাশক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তা—অমানুষিক। মাতার কথা শুনিয়া সে আনন্দে এমন আত্মহারা হইয়া গেল যে, স্বপ্নাবিষ্টের মত একদৃষ্টে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল, মুখ দিয়া কথা ফুটিল না। কেবল একটা অত্যন্ত উজ্জ্বল দীপ্তি—ঊষার স্নিগ্ধ ছটার মত—তাহার সারা মুখখানি প্রদীপ্ত করিয়া দিল। তামিনা এত দিনের পরে রুস্তামপ্রদত্ত সেই পদক বাহির করিয়া দেখাইয়া বলিলেন—

"এই লও বাবা, তোমার পিতৃদত্ত অমূল্য উপহার, এই দেখ ইহার পিছনে তাঁহার নাম ও বংশের কথা লিখিত আছে। এস তোমার হাতে বাঁধিয়া দিই ; এ পদক মন্ত্রশক্তিবিশিষ্ট পরম আশ্চর্য্য, এক মুহূর্ত্তের জন্য ইহাকে কাছ ছাড়া করিও না। ইহার প্রভাবে তোমার যশ ও গৌরবে পৃথিবী ভরিয়া যাইবে, তোমার সমকক্ষ বীর একটিও থাকিবে না।'

তামিনা পরমযত্নে পুত্রের বাহুমূলে সেই পদক বাঁধিয়া দিয়া পুনরায় কহিলেন—

"কিন্তু বাবা, মায়ের একটা কথা শুন, একটা অনুরোধ রাখ, তোমার সত্য পরিচয় কা'রও কাছে প্রকাশ করিও না। এ কথা প্রচার হইয়া পড়িলে, তিনি শুনিতে পাইলে—সেই মুহূর্ত্তে আমার কোল হইতে তোমাকে কাড়িয়া লইয়া যাইবেন, আমি কি লইয়া বাঁচিয়া থাকিব ? আর তা ছাড়া, তোমার পিতা বাদশা আফ্রি-জিয়াবের পরম শত্রু, শুধু তাঁহার জন্যই বাদশা ইরাণীদের কিছুই করিতে পারিতেছেন না—বরং বারম্বার হারিয়া, অপমান ও

ক্ষতির বোঝা মাথায় বহিয়া, দিন দিন তাঁহার বিনাশকামনায় অধীর হইয়া উঠিতেছেন। এ কথা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তিনি যে কখন কি কৌশলে তোমাকে হত্যা—”

আর বলিতে পারিলেন না, চোখের জলে তামিনার বুক ভাসিয়া কণ্ঠস্বর বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু সোরাব সহসা বাঘের মত গর্জ্জিয়া বলিয়া উঠিল—

“কি ছার বাদশা ‘আফ্রিজিয়াবের’ ভয় কর মা? তোমার যে পুত্র একাকী পাহাড়ের উপরে সিংহের গহ্বরে ঢুকিয়া তাহাদের শাবক কাড়িয়া লইয়া আসে, ‘আফ্রিজিয়াব’ তাহার কি করিবে? বাবার নাম শুনিয়া আমার সেই বল আজ শতগুণ বাড়িয়াছে, আমি তোমার কাছে গর্ব্ব করিয়া বলিতেছি যে, আজ আমি একা পৃথিবী জয় করিতে পারি। মহাবীর রুস্তামের পত্নী তুমি—সোরাবের মা—পৃথিবীতে কাহাকে তোমার ভয়? শুন মা, আমি যে কল্পনা করিয়াছি, এ দেশের সকল বীর আমার একান্ত অনুরক্ত, তাহাদের লইয়া আমি বিজয়ীবাহিনী সৃষ্টি করিব, তারপর পিতার অন্বেষণে ইরাণে যাইব, তাঁহার সহিত আমার সৈন্য লইয়া বাদশা ‘কাইকুশকে’ দূর করিয়া দিয়া পিতাকে সেই সিংহাসনে বসাইব—তুমি তাঁহার বামে বসিয়া রাণী হইয়া প্রজাদের শাসন-পালন করিবে। তারপর সেই সকল ইরাণী-সৈন্য আমার তুরাণীসৈন্যের সঙ্গে মিলিত করিয়া লইয়া এ দেশে ফিরিব, বাদশা ‘আফ্রিজিয়াবকে’ দূর করিয়া দিয়া, তাঁহার সিংহাসন কাড়িয়া লইয়া আমি তুরাণের বাদশা হইব। পিতা-

পুত্রে দুই দেশের সম্রাট হইয়া—ইহাদের এতকালের সকল শত্রুতা মুছাইয়া—এক করিয়া মিলাইয়া দিব। তখন আমাদের পিতা-পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে কাহার শক্তি হইবে মা ? আমার অভাব কেবলমাত্র আমার উপযোগী একটি ভাল ঘোড়ার। বাবার 'রাক্‌স্' ঘোড়ার কথা যা' শুনিয়াছি তেমনি একটি ঘোড়া সংগ্রহ করিতে পারিলেই আমি সৈন্য লইয়া পিতার অন্বেষণে যাইব। সেই 'রাক্‌সের' একটি বাচ্ছা এখানে আছে তা'ও সংবাদ লইয়াছি—সে, ঠিক তেমনি তেজস্বী—তেমনি বলবান অশ্ব। সেইটি সংগ্রহ হইলে—সেই মুহূর্ত্তেই আমি যাত্রা করিব, কেউ বাধা দিতে পারিবে না। তুমি মা কোন দুশ্চিন্তা মনে স্থান দিও না—এ দৃঢ় সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে তোমার পুত্রের কিছুমাত্র বিলম্ব হইবে না, তুমি শুধু মন খুলিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, পৃথিবীতে আমার প্রত্যক্ষ দেবী তুমি, তোমার আশীর্ব্বাদে আমার সকল কামনা পূর্ণ হইবে।"

সোরাবের বদনমণ্ডলে একটা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল আভা ক্রীড়া করিতে লাগিল। তাহার পানে চাহিয়া তামিনার হৃদয়ের সমস্ত আশঙ্কা ঘুচিয়া গেল—ভয় দূরীভূত হইল, গভীর স্নেহের আবেগে পুত্রকে বুকে ধরিয়া গদ গদ স্বরে ডাকিলেন—

"বাবা—বাবা—"

"মা, মা, আমাকে সেই ঘোড়া আনাইয়া দাও।"

বলিয়া সোরাব ক্ষুদ্র শিশুটির মত আবদার করিয়া দুই হাতে জননীর গলা জড়াইয়া ধরিল।

## অষ্টম পরিচ্ছেদ

### যুদ্ধযাত্রা

বাদশা 'আফ্রিজিয়াব' যখন শুনিলেন যে সোরাব 'সামানগানের' বহুসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লইয়া পিতার অন্বেষণের জন্য ইরাণে যাইতেছে, তখন তাঁহার কূট বুদ্ধিতে একটা ভয়ানক মতলব আঁটিলেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত সেনানায়ক 'হুমান' ও 'বার্ম্মানকে' গোপনে ডাকিয়া চুপি চুপি বলিলেন—

"তোমরা তোমাদের অধীনস্থ সৈন্যদল লইয়া এখনি গিয়া সোরাবের সঙ্গে যোগ দাও এবং তাহাকে গিয়া বল যে তুমি ইরাণীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছ শুনিয়া বাদশা অত্যন্ত খুসী হইয়া, তোমাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহার নিজের সৈন্য ও আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন। আমরা তোমার অধীনে থাকিয়া তোমার আদেশ মত যুদ্ধ করিব।"

বাদশার কথা শুনিয়া যে হিংসায় সেনাপতিদ্বয়ের মুখ বিবর্ণ ও ললাট কুঞ্চিত হইয়া উঠিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া, মুখে বিরক্তি প্রকাশ করিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে কহিলেন—

"সোরাব তরুণ যুবক হইলেও তাহার সমান বলবান ও রণদক্ষ বীর তুরাণে যদি একজনও থাকিত, তাহা হইলে রুস্তাম রক্ষিত 'কাইকুশের' সিংহাসন আমরা অনেকদিন আগে দখল করিতে পারিতাম। তাহার শৈশব-ক্রীড়ার কথা শুনিলে তাহাকে

মানুষ বলিয়া মনে হয় না—বাপের চেয়ে ছেলে শতগুণে বেশী পরাক্রমশালী হইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ ঈশ্বরদত্ত শক্তি, ইহাতে হিংসার কথা নাই, বরং ভয়ের কথাই বেশী। সোরাব যদি ইরাণে গিয়া কোন মতে একবার রুস্তামকে সন্ধান করিয়া বাহির করিতে পারে, তা হইলে আর আমাদের নিস্তার থাকিবে না, পিতা-পুত্রে মিলিত হইলে সেই দণ্ডেই আসিয়া তুরাণের সিংহাসন কাড়িয়া লুইবে। পৃথিবীতে এমন কে বীর আছে যে তাহাতে বাধা দিতে পারে ? তুরাণদেশে, তুরাণী মাতার গর্ভে জন্মিলেও এ দেশের প্রতি সোরাবের কিছুমাত্র মমতা বা সম্মান থাকিবে না—পিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রযুক্ত তুরাণের সর্ব্বনাশ করিবে। সুতরাং এখন আমাদের প্রধান শত্রু একমাত্র সোরাব, তাহাকে কৌশলে বিনাশ করিতে হইবে। আমি এতদিন ইহাই চিন্তা করিতেছিলাম, ঈশ্বর এক্ষণে সেই মহা সুযোগ আনিয়া দিয়াছেন।”

বাদশার মনোভাব অবগত হইয়া ‘হুমান’ ও ‘বর্ম্মানের’ ক্ষোভ ঘুচিল, মনে আনন্দের উদয় হইল, উৎসাহভরে জিজ্ঞাসা করিল—

“এ যুদ্ধে সে সুবিধা আমাদের কিরূপে হইবে ?”

“শুন—পিতা-পুত্র কেহ কাহারও পরিচিত নহে, সুতরাং আমাদের বিশেষ কষ্ট করিতে হইবে না, একটু সতর্কতার সহিত কৌশলে চলিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। সোরাবের বাহিনী ইরাণে প্রবেশ করিলেই হৈ হৈ পড়িয়া যাইবে; সে যে তাহার

পিতার অন্বেষণে চলিয়াছে তাহা কেহই জানে না, ভাবিবে তুরাণীরা ইরাণ আক্রমণ করিতে আসিয়াছে সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য। আর একবার যুদ্ধ বাধিয়া গেলে রুস্তামকে দেশ রক্ষার জন্য আসিতেই হইবে। সেই আমাদের পরম শুভ মুহূর্ত্ত। পিতা-পুত্র যাহাতে পরস্পরের পরিচয় না পায়, তোমরা কেবল সেই টুকু করিবে, তাহা হইলেই কার্য্য সিদ্ধ হইবে। আর শুধু কার্য্যসিদ্ধি কেন—আমাদের এতকালের আকিঞ্চন পূর্ণ হইবে, এত কালের যুদ্ধশ্রম, লোকক্ষয়, অর্থনাশ, মনঃপীড়া সমস্তেরই ক্ষতিপূরণ হইয়া যাইবে।”

“কেমন করিয়া তা হইবে বুঝিতে পারিতেছি না।”

“পিতা-পুত্রে পরস্পরের পরিচয় না পাইলে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু ভাবে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবে; কারণ, একমাত্র রুস্তাম ভিন্ন সোরাবের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এমন বীর অন্য আর কেহ ইরাণে নাই। আর তা’ হইলে সে যুদ্ধ সাধারণ হইবে না, বিজয়ী বীর রুস্তাম দেহে একবিন্দু শোণিত থাকিতে হটিবে না, কিন্তু সে বৃদ্ধ হইয়াছে—যুবক সোরাবের শক্তিকে কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতেও পারিবে না, তাহার ফলে পুত্রের হস্তেই তাহার বিনাশ নিশ্চয় ঘটিবে। আর তাহার অমানুষিক আক্রমণে যুবক সোরাবও শক্তি হারাইয়া প্রাণ দিবে। এই রূপে, এই দুই পিতাপুত্র যদি পরস্পর পরস্পরের যুদ্ধে নিহত হয়, তখন আর ইরাণে যোদ্ধা থাকিবে কয়জন? আমরা স্বচ্ছন্দে ‘কাইকুশকে’ বিনাশ করিয়া ইরাণ অধিকার করিতে

পারিব। বুঝিলেত? এখন শীঘ্র সৈন্য লইয়া গিয়া সোরাবের সঙ্গে যোগ দাও এবং দিবারাত্রি ছায়ার মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া কেবল যুদ্ধে উত্তেজিত করিতে থাক। সকলকে বিশেষ রূপে সতর্ক করিয়া দাও যে ইরাণে গিয়া যখন রুস্তামকে যুদ্ধক্ষেত্রে আসিতে দেখিবে, তখন কেউ না তাহাকে রুস্তাম মনে করিয়া ভীত হইয়া পড়ে, কেউ না কোন সূত্রে প্রকাশ করিয়া দেয় যে এই সেই ভুবনবিখ্যাত ইরাণীবীর রুস্তাম!”

বাদশা আফ্রিজিয়াবের নির্দ্দেশমত ‘হুমান’ ও ‘বার্ম্মান’ বহু-সংখ্যক সুশিক্ষিত তুরাণী রাজসৈন্য লইয়া অচিরেই যাত্রা করিল এবং ‘সামানগানে’ পৌঁছিয়াই সোরাবের কাছে গিয়া কহিল—

“আপনি মহামান্য বীর, দেশের সুসন্তান, নিজের উদ্যমে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ইরাণীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিতেছেন শুনিয়া বাদশা অত্যন্ত খুসী হইয়া আপনার সাহায্যের জন্য আমাদের সহিত অগণিত সৈন্য এবং প্রশংসাবাদ প্রেরণ করিয়াছেন। আমরা দুইজন তাঁহার চিরবিশ্বস্ত অনুচর প্রধান সেনানায়ক, আজ হইতে আপনার অধীনে, আপনার আদেশ মত যুদ্ধে প্রাণপাত করিব। ধন্য তুরাণ—আপনার মত মহাবীর সুসন্তান প্রসব করিয়াছে! এতদিনে তুরাণের অপমান ঘুচিবে, মুখ উজ্জ্বল হইবে—‘কাইকুশ’ বাদশার শেষ দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। দয়া করিয়া আমাদের সহকারী করিয়া লউন—আপনার মত দেশ-প্রাণ মহাবীরের জন্য আমাদের দেহের শেষ রক্তবিন্দুটি পর্য্যন্ত প্রদান করিতে কেহ কাতর হইব না।”

তোষামোদ বাক্যে সোরাবের তরুণ অন্তঃকরণ গলিয়া গেল। সে যখন নিজের উদ্যমে বাহিনী সাজাইয়া যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছে তেমন সময়ে বাদশাহের এই অনুগ্রহের দানকে সে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভাবিয়াই সসম্মানে শিরে তুলিয়া লইল এবং 'আফ্রিজিয়াবের' নামে জয়ধ্বনি করিয়া কহিল—

"তাঁহার, এই অযাচিত অনুগ্রহের কথা চিরদিন স্মরণ করিব। আসুন বীরগণ, আপনাদের সকলকে লাভ করিয়া আজ আমি ধন্য হইলাম, আপনারা ইরাণের পথ ঘাট আচার ব্যবহার বীরত্ব বিক্রম সমস্তই অবগত আছেন, আপনাদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া কোন কার্য্য করিব না। আপনারা বাদশাহের বিশ্বস্ত, প্রধান সেনাপতি ছিলেন এখানেও আপনারা দুইজন আমার দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হইলেন, আপনাদের সাহায্যে আমি কৃতার্থ হইয়াছি।"

বলিয়া, সরলহৃদয় উদার যুবক পরে পরে উভয়কে আলিঙ্গন করিয়া সম্মানিত করিল। হুমান ও বার্ম্মানের চেষ্টা এবং উদ্যোগে যুদ্ধযাত্রায় আর বিলম্ব হইল না। অচিরেই সেই সম্মিলিত অগণিত সেনা সোরাবের জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া ইরাণের অভিমুখে অগ্রসর হইল। সোরাব বর্ম্ম এবং অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া মাতার কাছে বিদায় লইয়া অশ্বে আরোহণ করিল।

## নবম পরিচ্ছেদ

### গার্দ্দাফ্রিজ

জিহুন নদীর উত্তরে যেমন তুরাণের সামানগান নামক নগর, দক্ষিণেও তেমনি বিস্তৃত বনভূমির পরেই ইরাণের 'শ্বেতদুর্গ' নামে একটি সুদৃঢ় কেল্লা এবং ক্ষুদ্র নগর। এই দুর্গে 'হুজীর' নামক এক বীর রাজত্ব করিয়া ইরাণ দেশের সীমা প্রদেশে শান্তি রক্ষা করিতেন।

বাদশা আফ্রিজিয়াব যেমন অনুমান করিয়াছিলেন তাহা মিথ্যা হইল না। সোরাবের বিপুল বাহিনী রণবাদ্য বাজাইয়া বিরাট গর্ব্বে যখন জিহুন নদী পার হইয়া ইরাণের প্রান্তসীমায় গিয়া উপস্থিত হইল, তখন সে সংবাদ বিদ্যুতের মত দ্রুত-গতিতে প্রথমে শ্বেতদুর্গে এবং সেখান হইতে দেশময় ছড়াইয়া পড়িতে বাকী থাকিল না। মুহূর্ত্তের ভিতরেই চারিদিকে 'সাজ সাজ' রব পড়িয়া গেল এবং সকলেই তুরাণী শত্রুগণকে দূর করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইল।

শ্বেতদুর্গেও রণসজ্জার ধূম পড়িয়া গিয়াছিল। বাদশা 'কাইকুসের' নিকটে তুরণীদের হঠাৎ আক্রমণের সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া হুজীর শ্বেতদুর্গের সকল যোদ্ধাকে একত্রিত করিলেন। দুর্গরক্ষা ও যুদ্ধের ব্যবস্থা করিয়া আপনি বর্ম্ম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইলেন। পরে অশ্বে আরোহণ করিয়া তুরাণীদের শিবিরের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার

অধীনস্থ বীরগণও তাঁহার সহিত যুদ্ধে গমন করিতে বিলম্ব করিলেন না।

এই 'হুজীর' একজন বলবান ও বিখ্যাত যোদ্ধা, তুরাণীদের সহিত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেশবাসিগণ হইতে বাদশার পর্য্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। তাহারই ফলে শ্বেতত্নর্গের আধিপত্য লাভ করিয়া গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিয়াছিলেন। বনভূমির প্রান্তে যেখানে সোরাবের তুরাণী সৈন্যগণ শিবির স্থাপন করিয়া বিশ্রাম করিতেছিল, সেইখানে একাকী বিত্যুদ্বেগে অগ্রসর হইয়া গিয়া দম্ভভরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"তোমাদের ভিতর এমন কেউ বলবান, রণদক্ষ যোদ্ধা আছে যে আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে সাহস কর? যদি থাক তো শীঘ্র বাহির হইয়া আইস, এখানেই বল পরীক্ষা হউক, তারপর ইরাণ আক্রমণের তুরাশা মনে মনে লয় পাইয়া যাইবে। শ্বেতত্নর্গে হুজীর বর্ত্তমান থাকিতে তোমাদের এত দূর স্পর্দ্ধা যে রণডঙ্কা বাজাইয়া ইরাণে প্রবেশ কর? শীঘ্র আইস নচেৎ ভীরু কাপুরুষের মত এখনি আমার সৈন্যগণের হস্তে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মরিবে।"

হুজীরের সেই দম্ভের আহ্বান সোরাবের কাণে যাইতে বিলম্ব হইল না, সে তৎক্ষণাৎ সজ্জিত বেশে ঘোড়ায় চড়িয়া ছুটিয়া আসিয়া কহিল—

"এই যে আমি আসিয়াছি, এখন বৃথা বাক্যাড়ম্বর রাখিয়া

কার্য্যে নিজের পরিচয় দাও—নচেৎ পলাইয়া প্রাণ রক্ষা কর, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে তোমার নিস্তার থাকিবে না।

সোরাবের কথায় হুজীর বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং গর্জ্জন করিয়া নানা প্রকার কটু কহিয়া বল্লম তুলিয়া অগ্রসর হইল। সোরাব তাহার কথার জবাব করিল না, বিশাল ঢালে তাহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া এমন দৃঢ়হস্তে আপন বল্লম নিক্ষেপ করিল যে, তাহা হুজীরের বর্ম্মে বজ্রের মত সজোরে আঘাত করিয়া তাহাকে অশ্ব হইতে ঠেলিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিল। সোরাব বিদ্যুতের মত চকিতে আপন অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িয়াই হুজীরের বুকের উপর জানু চাপিয়া বসিয়াই তাহার শিরশ্ছেদনের জন্য তরবারি তুলিল। তখন হুজীরের চৈতন্য হইল, দম্ভ আস্ফালন উড়িয়া গেল, ভয়ে মুখ শুকাইল, কাতরভাবে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল—

“রক্ষা কর যুবক বীর, আমি তোমার কাছে দ্বন্দ্বযুদ্ধে হারিয়াছি, আমাকে বধ করিও না—প্রাণ ভিক্ষা দাও।”

সোরাব তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং হাসিয়া কহিল—

“তোমার প্রাণ দিলাম, কিন্তু স্বাধীনতা দিতে পারিব না, যুদ্ধের নিয়মানুসারে বন্দী করিয়া লইয়া যাইব।”

হুজীর জবাব করিতে পারিল না—নীরব রহিল।

সোরাবের আজ্ঞায় তাহার সৈন্যগণ আসিয়া হুজীরকে নিরস্ত্র করিয়া শৃঙ্খলে বাঁধিয়া লইয়া গেল।

হুজীরের সৈন্যগণ অদূরে দাঁড়াইয়া তাহাদের প্রভুর পরাজয় স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করিল, এবং পরক্ষণেই তুরাণীসৈন্য তাহাদিগের দিকে যাইতে না যাইতে তাহারা পলাইয়া দুর্গে গিয়া সংবাদ প্রদান করিল।

হুজীরের পরাজয়ে যে অপমানের বহ্নি দুর্গবাসিগণের শিরায় শিরায় জ্বলিয়া উঠিল তাহাতে তাহারা আর বিলম্ব করিতে পারিল না, অতঃপর কিরূপে তুরাণীগণের সহিত যুদ্ধ করিবে সেই মন্ত্রণা করিতে লাগিল।

শ্বেতদুর্গে এক উচ্চবংশের পরাক্রমশালী যুবতী তাহার বৃদ্ধ পিতার সহিত বাস করিত। বাল্য-কাল হইতে এই রমণী পুরুষের বেশে সজ্জিত হইয়া পুরুষের মত রণ-বিদ্যা শিখিয়া দেশের ভিতরে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। সকলেই বিস্ময়ে বলাবলি করিত যে "গার্দ্দাফ্রিজের" মত বীরনারী যে দেশে জন্মগ্রহণ করে, সে দেশে রুস্তামের মত বীরের মৃত্যুর পরেও—শত্রুর আশঙ্কা কিছুমাত্র নাই।"

বাস্তবিকই "গার্দ্দাফ্রিজ" শারীরিক বলে যেমন বীর্য্যবতী ছিল, তেমনি রণকৌশলেও কম ছিল না। তাহার বৃদ্ধ পিতা বীরবর রুস্তামের সঙ্গে বহু যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া যে সকল অদ্ভুত প্রকারের অস্ত্র প্রয়োগ এবং রণ-কৌশল প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহার প্রায় সমস্তই কন্যাকে শিক্ষা দিয়া এমন গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল যে, 'গার্দ্দাফ্রিজের' হাতের অব্যর্থ অস্ত্রনিক্ষেপ দেখিয়া বড় বড় যোদ্ধারা অবাক হইয়া যাইত।

'গার্দ্দাফ্রিজও' ইরাণের নানা উৎসব উপলক্ষে আপনার রণ-পাণ্ডিত্য ও শক্তির পরিচয় দিয়া স্বদেশবাসিগণকে আনন্দ দান করিতে ত্রুটি করিত না।

'হুজীরের' পরাজয়ের বিবরণ শুনিয়া তাহার দুই চক্ষু দিয়া আগুন ছুটিল, তৎক্ষণাৎ ভৈরবী-মূর্ত্তিতে মন্ত্রণাস্থলে গিয়া বলিয়া উঠিল—

"ইরাণী হইয়াও হুজীর যে অক্ষমতা ও কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছে তাহাতে সমস্ত ইরাণবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের মস্তক অপমানে হেঁট হইয়াছে, এ লজ্জা রাখিবার আমাদের আর স্থান নাই। এখন যদি সেই যুবক বীরকে কেউ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাস্ত করিতে পার, তা' হইলে কতক পরিশোধ হইতে পারে—তাহার কি করিতেছ ?"

"আমরা আর কি করিব মা ? এ দুর্গের ভিতরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিল হুজীর, তুরাণীগণের সঙ্গে বহুযুদ্ধে সে বিক্রম প্রকাশ করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। এই যুবক-বীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে সে যখন এমন করিল, তখন বাদশাহী ফৌজের সহায়তা ভিন্ন আমরা আর কি করিতে পারি ? এ দুর্গে আর এমন বীর কে আছে যে সেই যুবক-বীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করিবে ?"

হুজীর যাহার উপরে দুর্গরক্ষার ভার দিয়া গিয়াছিল, 'গার্দ্দাফ্রিজের' সেই বৃদ্ধ পিতা যখন ওই কথা বলিল, তখন কন্যার আর সহ্য হইল না, তীব্রকণ্ঠে গর্জ্জিয়া উঠিল—

"কেন বাবা, বৃদ্ধ হইয়া আপনি কি আপনার কন্যার বল-বীর্য্য ও রণশিক্ষার কথা বিস্মৃত হইয়াছেন? আর কেউ যদি এ অপমান ও অপযশের কলঙ্ক ধৌত করিতে সাহস না করে, আমি করিব। ইরাণের কন্যা হইয়া আমি এ কলঙ্ক মাথায় বহিয়া একদণ্ডও নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিব না। কোন চিন্তা নাই—আপনারা দুর্গরক্ষার ব্যবস্থা করুন। আমি এখনি চলিলাম, সেই তুরাণী যুবক-বীরের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া বুঝাইয়া দিব যে ইরাণের একটা ক্ষুদ্র নারীরও শরীরে যে শক্তি আছে তা' তাহাদের সমস্ত বাহিনীরও নাই।"

বলিয়াই গার্দ্দাফ্রিজ উন্মত্তের মত ছুটিয়া চলিয়া গেল, এবং ক্ষণকাল পরেই যে অপূর্ব্ব বেশে সজ্জিত হইয়া আসিল, তাহা দেখিয়া সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল।

গার্দ্দাফ্রিজকে আর স্ত্রীলোক বলিয়া চিনিবার যো ছিল না। সুদৃঢ় কঠিন বর্ম্মে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত হইয়াছিল, দীর্ঘ শিরস্ত্রাণে মাথার লম্বমান কেশ ঢাকিয়া গিয়াছিল। সমর-সজ্জায় ঠিক সোরাবেরই মত যুবক-বীর দেখাইতেছিল। কটিতে তরবারি, পৃষ্ঠে পূর্ণ তূণ ও ধনু বাঁধিয়া, হস্তে সুতীক্ষ্ণ দীর্ঘ বল্লাম লইয়া সে যখন আসিয়া পিতার কাছে আশীর্ব্বাদ ও বিদায় প্রার্থনা করিল, তখন সমবেত সকলেই মুগ্ধভাবে তাহার জয়ধ্বনি করিয়া উৎসাহে বলিয়া উঠিল—

"এমন যোদ্ধা পাইলে শুধু তুরাণী শত্রু কেন আমরা সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেও ভীত নই। ধন্য

সেই দেশ—যেখানে গার্দ্দাফ্রিজের মত বীরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে।

কিন্তু গার্দ্দাফ্রিজ আর বৃথা স্তুতিবাদ শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, সেই মুহূর্ত্তেই বিদায় লইয়া আপনার অশ্বকে তুরাণীদের শিবিরের অভিমুখে অতি দ্রুত চালাইয়া দিল।

'হুজীর'কে বন্দী করিয়া আনিয়া তুরাণীগণের আনন্দের পরিসীমা ছিল না। প্রথম যুদ্ধে অতি সহজে জয় লাভ করিয়া সকলেই একযোগে 'শ্বেতদুর্গ' অধিকার করিবার মন্ত্রণা করিতেছিল। তেমন সময়ে গার্দ্দাফ্রিজ গিয়া যখন সোরাবকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল, তখন তাহার তরুণ বয়স ও সুকুমার মুখশ্রী দেখিয়া সকলেই অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সোরাব হাসিয়া কহিল—

"বালক, সাধ করিয়া কেন এ আগুনে পুড়িয়া মরিতে আসিয়াছ, দুর্গে ফিরিয়া যাও, তোমাদের বাদশার কাছে সংবাদ পাঠাইয়া উপযুক্ত সৈন্যবল আনাও—ততদিন আমরা তোমাদের দুর্গে হস্তক্ষেপ করিব না।"

গার্দ্দাফ্রিজ হাসিতে বিদ্যুৎ খেলাইয়া জবাব করিল—

"বীর, তোমার মহত্ত্বের জন্য ধন্যবাদ দিতেছি, কিন্তু তুমিও তো আমারই মত বালক, সুতরাং বালক বলিয়া আমাকে উপেক্ষা করিতেছ কেন? আমি 'হুজীর নহি যে অত সহজে বন্দী করিয়া লইবে। শক্তি থাকে আক্রমণ প্রতিরোধ কর।"

বলিয়া দ্রুতহস্তে তীর বর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহার ললিত

মুখশ্রী দেখিয়া এবং মধুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া সোরাবের অস্ত্রাঘাতের ইচ্ছা মনে আসে নাই, সে লম্বা দড়ির ফাঁস করিয়া তাহার গলায় ছুড়িয়া লাগাইয়া—বিনা রক্তপাতে তাহাকে বন্দী করিবার আয়োজন করিতেছিল। তেমনি অতর্কিত অবস্থায় যখন অসংখ্য তীর আসিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, তখন সোরাব আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। সুকৌশলে গার্দ্দাফ্রিজের সকল তীর হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে সহসা এমন জোরে বল্লাম ছুড়িয়া মারিল যে, তাহা গার্দ্দাফ্রিজের কঠিন বর্ম্ম ভেদ করিয়া পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিল। গার্দ্দাফ্রিজ বিদ্যুৎগতিতে বল্লাম টানিয়া খুলিয়া লইল, কিন্তু সূক্ষ্ম ফোয়ারার মত রক্ত ছুটিয়া তাহার সজ্জা সিক্ত করিয়া দিল। মুহূর্ত্তের সেই অবসরে সোরাব তাহার দড়ির ফাঁস এমন সুকৌশলে নিক্ষেপ করিল যে, তাহা গার্দ্দাফ্রিজের মাথা দিয়া গলিয়া কোমরে গিয়া বাধিল। সোরাব উচ্চ হাসিয়া ঘোড়া হইতে নামিয়া তাহাকেও নামিতে বাধ্য করিল। সেই সময়ে সোরাবের অস্ত্র লাগিয়া গার্দ্দাফ্রিজের মাথার শিরস্ত্রাণ খসিয়া গেল এবং তাহার সুদীর্ঘ কেশের রাশি পীঠের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া নিজের পরিচয় ব্যক্ত করিয়া দিল। সোরাব দুঃখের সহিত বলিয়া উঠিল—

"তোমার দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু হায় সুন্দরী! স্ত্রীলোক হইয়া কেন তুমি এই জীবন-মৃত্যুর মহা ক্রীড়াস্থলে ছদ্মবেশে যুঝিতে আসিয়াছ। আমি যথার্থই

তোমার জন্য অনুতপ্ত, কিন্তু তবুও ছাড়িতে পারিব না, বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে হইবে, সে জন্য আমায় দোষ দিও না।”

হুজীরের যে পরাজয়ে গার্দ্দাফ্রিজ উত্তেজিত হইয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল—তাহাকেও সেই দুর্ভাগ্য বরণ করিয়া লইল দেখিয়া, সে মনে মনে অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া কহিল—

“বীর যুবক, যথার্থই তুমি বীর নামের ন্যায্য অধিকারী, তোমার যেমন বীর্য্যের তুলনা নাই তেমনি চরিত্রের মহত্ত্ব এবং উদারতাও সামান্য নহে—তোমার কাছে পরাজয় আমার লজ্জার অপেক্ষা অধিক গৌরবের বিষয়। কিন্তু আমাকে বন্দী করিয়া কেন নিজের অসম্মান বরণ করিয়া লইবে? একটা ক্ষুদ্র রমণীকে পরাজিত করিয়া তোমার মত বীরের কিছুমাত্র গৌরব বা পৌরুষ নাই—বরং কলঙ্ক আছে। লোকে বলিবে যে তুরাণী বীর একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিয়াছে। শুন আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমার বৃদ্ধ পিতা এক্ষণে দুর্গের আধিকারী, তাঁহাকে বলিয়া—দুর্গমধ্যে যা কিছু ধনরত্ন আছে সমস্তই তোমাকে অর্পণ করিব, বিনা বিসম্বাদে তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে।”

সোরাব স্ত্রীলোকের সহিত যুঝিয়া নিজেই লজ্জিত হইয়াছিল সুতরাং কথাটা তাহার মনে লাগিল, রমণীকে মুক্ত করিয়া কহিল—

“বেশ মুক্তি দিলাম—কিন্তু নিজের প্রতিজ্ঞা রাখিও।”

কিন্তু গার্দ্দাফ্রিজ সে প্রতিজ্ঞা রাখিল না, বরং দুর্গে গিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া ছাদের উপর হইতে উপহাস করিয়া কহিল—

"রণে প্রতারণার রীতি আছে সুতরাং কিছু মনে করিও না, কিন্তু তোমাকে সতর্ক করিয়া দিতেছি—এই বেলা দেশে ফিরিয়া যাও। বাদশার কাছে সংবাদ গিয়াছে, মহাবীর রুস্তাম আসিতেছেন, আর তোমাদের রক্ষা নাই—শীঘ্র পলাইয়া আত্মরক্ষা কর।"

বলিয়াই অদৃশ্য হইল। ক্ষোভে, রোষে, লজ্জায়, মলিন হইয়া সোরাব প্রতিজ্ঞা করিল—"আজ সন্ধ্যা হইল, কাল সকালে আসিয়া দুর্গ জয় করিয়া এ অন্যায়ের প্রতিশোধ দিব।"

---

## দশম পরিচ্ছেদ

### কাইকুস

কিন্তু প্রভাতে যখন সোরাব সৈন্য লইয়া তোরণ ভগ্ন করিয়া বন্যার স্রোতের মত দুর্গের ভিতরে প্রবেশ করিল, তখন সেখানে আর একটি প্রাণীও অবশিষ্ট ছিল না। সোরাব বুঝিল যে দুর্গবাসীরা তাহার আক্রমণের আশঙ্কায় রাত্রি যোগেই দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলাইয়াছে। তখন সে সেই দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া ইরাণের রাজধানীর অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া লইয়া চলিল।

কিন্তু বাদশা কাইকুস যখন সে সংবাদ পাইলেন, তখন অত্যন্ত ভীত হইয়া মন্ত্রী, সভাসদ ও প্রধান ওমরাহ এবং যোদ্ধাগণকে

ডাকিয়া উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বসিলেন। সকলেই একবাক্যে কহিল—

"খামিন, এরূপ অসীম বলশালী, রণবিদ্যায় সুপণ্ডিত অদ্বিতীয় বীর যুবক, আমরা কোথাও আছে বলিয়া শুনি নাই। আকৃতি প্রকৃতি এবং শৌর্য্য-বীর্য্যে যেন দ্বিতীয় রুস্তাম যুবক বেশে আবির্ভূত হইয়াছে, সমস্ত ইরাণের ভিতরে একমাত্র রুস্তাম ভিন্ন যুবকের সমকক্ষ বীর আর কেহই নাই। সে প্রথমেই যে ভীষণ প্রতাপে আমাদের সীমান্তের শ্বেতদুর্গ হস্তগত করিয়াছে—তাহাতে সমস্ত দেশবাসী শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে, কেহই তাহার সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইতে সাহস করে না। গুপ্তচর সংবাদ আনিয়াছে যে, শ্বেতদুর্গ হস্তগত করিয়াই বীর যুবক সোরাব সসৈন্যে রাজধানীর দিকে আসিতেছে, আর নিশ্চিন্ত থাকা কর্ত্তব্য নহে। শীঘ্র জাবুলীস্থানে দূত পাঠাইয়া রুস্তামকে আনাইয়া তাহার হস্তে যুদ্ধভার অর্পণ করুন! একমাত্র রুস্তাম ভিন্ন এ বিপদে রক্ষা করিবার আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই।"

এই কথায় বাদশা 'কাইকুস' আরও ভীত হইয়া পড়িলেন এবং সেই দণ্ডেই একপত্রে সকল কথা লিখিয়া রুস্তামকে আনিবার জন্য জাবুলীস্থানে দূত পাঠাইলেন এবং তাহাকে বিশেষ করিয়া আদেশ করিলেন যে রুস্তামের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সেই দণ্ডেই তাঁহাকে আনয়ন করিবে, পথে কি কোথাও কোন কারণেই এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব করিতে পারিবে না।

কিন্তু রুস্তাম যখন সে পত্র পাইলেন, তখন তাঁহার প্রাণের ভিতর সহসা যেন কেমন করিয়া উঠিল। পত্রের যেখানে সোরাবের বিবরণ লিখিত ছিল, সেই স্থানটুকু বারম্বার পড়িয়া ভাবিতে লাগিলেন—আকৃতি-প্রকৃতি, শৌর্য্য-বীর্য্যে ঠিক তাঁহারই মত কে যুবক বীর সহসা তুরাণ হইতে আসিল, তবে কি সে তাঁহারই পুত্র? না—না—তাই বা কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? তামিনার কন্যা হইয়াছে বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল, যদি তাহার পুত্র সন্তান হইত, তা হইলে তিনি কখনও সে সুখের সংবাদ না দিয়া স্থির থাকিতে পারিতেন না, আর এত দিনে সে পুত্রও বড় হইয়া তাহার পিতার সহিত সাক্ষাতের জন্য ছুটিয়া না আসিয়া থাকিতে পারিত না। এ তাঁহার কেহই নহে—দৈবযোগে কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া তাহাকে নিজের ছেলে ভাবিবার কোন কারণ নাই। এ তুরাণ হইতে ইরাণ আক্রমণ করিতে আসিয়াছে সুতরাং তাঁহার দেশের এবং নিজের শত্রু! এই অসমসাহসী দাম্ভিক যুবকের উচ্চাকাঙ্ক্ষার উপযুক্ত প্রতিফল দিতেই হইবে। হায়রে ভাগ্য!

কিন্তু ব্যাপারটা তিনি কিছুতেই গুরুতর ভাবিতে পারিলেন না। কোথাকার কে একটা নগণ্য যুবক নিজের বলে গর্ব্বে মাতিয়া—পতঙ্গের মত—আগুনে ঝাঁপ দিয়াছে, তিনি গমনমাত্র যে তাহাকে দগ্ধ করিয়া মারিবেন তাহাতে আর সন্দেহ ছিল না। সুতরাং উপেক্ষাভরে দূতকে কহিলেন—

"আমাদের বাদশা ভীরু কাপুরুষ, তাই একটা তুচ্ছ

বালকের ভয়ে অধীর হইয়া রুস্তামকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। এ ব্যাপার কিছুমাত্র গুরুতর নহে, সুতরাং অত ব্যস্ত হইবার আবশ্যক দেখিতেছি না। তুমি দীর্ঘ পথ হাঁটিয়া আসিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছ, দুই চারি দিন বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হও, তারপর এক সঙ্গে উভয়ে গমন করিব।"

দূতের মনে বাদশার কঠোর আদেশবাণী জাগিতেছিল, তবুও দেশপ্রসিদ্ধ মহাবীরের কথা ঠেলিতে পারিল না। অবশেষে চার পাঁচ দিন জাবুলীস্থানে কাটাইয়া যখন রুস্তাম তাঁহার ভ্রাতা জহুর এবং তাঁহার দুর্দ্ধর্ষ জাবুলী সৈন্যগণকে সঙ্গে লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিল, তখন তাহাদের বিলম্বে রাজা ক্রোধে জ্বলিয়া মনে মনে ফুলিতেছিলেন, রুস্তামকে দেখিয়াই দূতের পানে রক্তচক্ষে চাহিয়া গর্জ্জিয়া কহিলেন—

"রুস্তাম যখন আমার আদেশ অমান্য করিয়া এত বিলম্বে আসিয়াছে, তখন, আমার হাতে তরবারি থাকিলে এই মুহূর্ত্তে তাহার ধৃষ্টতার দণ্ড দিতাম। যাও, সে হতভাগ্য কাপুরুষকে এইদণ্ডে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া মস্তক ছেদন কর।"

কিন্তু সে দূত তো নড়িলই না—অধিকন্তু সভাশুদ্ধ সকলেই ভয়ে, বিস্ময়ে, ক্ষোভে, দুঃখে অবাক্ হইয়া কাঠের পুতুলের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রুস্তাম ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন—

"হতভাগ্য অকৃতজ্ঞ বাদশা, সাধ্য থাকে—আমি তোমাকে তরবারি দিতেছি—অগ্রসর হইয়া এস। যে রুস্তাম নিজের

জীবন উপেক্ষা করিয়া বহুবার তোমার মাথা বাঁচাইয়া দিয়াছে; আজ পর্য্যন্ত যাহার জন্য সিংহাসনে বসিয়া আছ, তাহার প্রতি এই ব্যবহার! সিংহাসনের কলঙ্ক! তোমার নাম মুখে আনিলেও অকৃতজ্ঞতা-পাপে জিহ্বা কলুষিত হয়। রুস্তাম মনে করিলে বহুদিন পূর্ব্বেই ওই মুকুটে এই মস্তক শোভিত হইত, এখনও মনে করিলে তা হইতে পারে, কিন্তু, না আমি চলিলাম। ঈশ্বর তোমার বিচার করিবেন, যে তুরাণী যুবক শমন রূপে ইরাণে আসিয়াছে তাহার হস্তেই তোমার পাপের শাস্তি হইবে। চল ভাই সব, এ রাজার সহিত আর আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। সাধ্য থাকে বাদশা! আমাদিগকে ইরাণ হইতে তাড়াইয়া দিতে আসিও।"

বলিয়াই রুস্তাম তাঁহার ভ্রাতা, এবং আপন সৈন্যগণকে লইয়া রাজবাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। তখন বৃদ্ধ ওমরাহ গুডার্জ বাদশাকে কহিল—

"হায় খামিন, মুহূর্ত্তের ক্রোধের বশে দেশের কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিলেন। রুস্তাম তরবারি না ধরিলে সমগ্র ইরাণ প্রদেশ যে এই মুহূর্ত্তেই তুরাণীগণের অধীন হইয়া যাইবে, কে তাহাতে বাধা দিয়া রক্ষা করিবে? শত্রু তাড়াইতে রুস্তামকে ডাকিয়া আনিয়া এখন বিবেচনার অভাবে শত্রুদেরই সুযোগ করিয়া দিলেন! বুঝিলাম এতদিনের পর ইরাণের প্রতি বিধাতা বিমুখ হইয়াছেন আর রক্ষা নাই—আর রক্ষা নাই।"

গুডার্জকে বাদশা যেমন ভালবাসিতেন তেমনি শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন। তাহার কথা শুনিয়া তিনি আপনার অন্যায় বুঝিলেন এবং অনুতপ্ত চিত্তে অধীর ভাবে কহিলেন—

"যাও গুডার্জ—শীঘ্র যাও, যেমন করিয়া পার রুস্তামকে ফিরাইয়া আন, তোমার অনুরোধ সে কখনো ঠেলিতে পারিবে না।"

রাজবাটী ত্যাগ করিয়া রুস্তাম সেই দণ্ডেই আবার নিজের দল বল লইয়া জাবুলীস্থানে ফিরিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে-ছিলেন, এমন সময়ে গুডার্জ গিয়া বাধা দিয়া রাজার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া কহিল—

"জান তো ভাই, আমাদের বাদশার মনুষ্যত্ব নাই—তাঁহার কথায় রাগ করিয়া তুমি স্বদেশের সর্ব্বনাশ করিতে চাও। তুমি চলিয়া গেলে—এই মুহূর্ত্তে সমস্ত ইরাণ তুরাণীদের করগত হইবে, তুমি তাহা সহ্য করিবে কেমন করিয়া? বাদশা অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছেন এবং তোমার কাছে মার্জ্জনা চাহিবার জন্য হাত বাড়াইয়া আছেন। এস ভাই, স্বদেশকে স্বেচ্ছায় শত্রুর হাতে সঁপিয়া দিও না। লোকে বলিবে যে রুস্তাম এক বালক শত্রুর ভয়ে দেশবাসীর সর্ব্বনাশ করিয়া গিয়াছে। এ বয়সে এ কলঙ্ক কিনিতে চাও কি?"

আর বেশী বলিতে হইল না, রুস্তাম সকলই বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ আবার দলবল লইয়া রাজপ্রাসাদে ফিরিয়া গেলেন। বাদশা 'কাইকুস' এবার অত্যন্ত সম্মানের সহিত

তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া অকপটে সর্ব্বসমক্ষে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিলেন। রুস্তামের মনের ক্ষোভ দূর হইল, তিনি কাইকুসকে সাহস দিয়া যুদ্ধের সকল ভার আপন হস্তে গ্রহণ করিলেন। বাদশাও যেমন নিশ্চিন্ত হইলেন, দেশের প্রধান প্রধান ওমরাহ রাজকর্ম্মচারীগণও তেমনি নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল।

দেশের দুঃখে রুস্তামের হৃদয় এমনই পীড়িত হইয়াছিল যে, তিনি সৈন্যভার গ্রহণ করিয়া সেই দিনেই যুদ্ধে গমন করিতে চাহিলেন। কিন্তু বাদশা কিছুতেই ছাড়িয়া দিলেন না। বীরবর রুস্তামের সম্মানের জন্য এক মহা ধূমধামে প্রীতিভোজের আয়োজন করিলেন।

সেদিন আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া পরদিন রুস্তাম সাগর প্রবাহের মত বিশাল ইরাণী বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

---

## একাদশ পরিচ্ছেদ

### প্রথম দর্শন

শ্বেতদুর্গ পরিত্যাগ করিয়া কিছুদূর অগ্রসর হইলে পরই রুস্তামের বাহিনীকে আগমন করিতে দেখিয়া সোরাবের হৃদয় উৎসাহে নাচিয়া উঠিল। তিনি তুরাণীরাজসেনার

শিবির পরিত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া কিছুদূরে একটি অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে শিবির পাতিয়া বসিলেন। রুস্তামের সহিত সোরাবকে পরিচিত করিয়া দিবার জন্য, তামিনা তাঁহার এক অনুগত সম্পর্কিত ভ্রাতাকে পাঠাইয়া, তাঁহার উপর সোরাবের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই ব্যক্তির নাম জিন্দা রুজিম। জিন্দা যেমন সোরাবকে প্রাণাধিক ভালবাসিতেন, তেমনি ছায়ার ন্যায় সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া সর্ব্বদা সৎপরামর্শ দিতেন। তিনি সোরাবকে নিভৃতে ডাকিয়া কহিলেন—

"বৎস, এইবারে আমাদের মনোসাধ পূর্ণ হইবে। বাদশা আমাদের দমন করিবার জন্য যে অগণন সৈন্য পাঠাইয়াছেন উহার ভিতরে মহাবীর রুস্তাম নিশ্চয় আছেন। উহারা যখন অদূরেই শিবির স্থাপন করিয়া বসিয়াছে, তখন আমাদের আশা পূর্ণ হইবার আর বিলম্ব নাই।"

মাতুলের মুখে সেই আশার বাণী শুনিয়া পিতৃ-দর্শনের আশায় সোরাবের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সে সেই রাত্রে নিজের শিবিরে এক বিরাট প্রীতি-ভোজের আয়োজন করিল।

এদিকে শিবির পাতিয়া বসিয়াই রুস্তাম কার্য্যে মন দিলেন। বিপক্ষদলের নেতার সম্বন্ধে যে সকল অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়াছিলেন, তাহাতে যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে তাহার গতিবিধি সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ লইবার জন্য, ছদ্মবেশে

সোরাবের প্রীতিভোজনে ছদ্মবেশী রুস্তাম—৫৯ পৃষ্ঠা

রাত্রিতে একা সোরাবের শিবিরের অভিমুখে চলিলেন। রুস্তাম তুরাণী সৈন্যের বেশে এমন সাজিয়াছিলেন যে, রাত্রির অন্ধকারে কেহই তাঁহাকে চিনিতে পারিল না।

সোরাবের শিবিরের ভিতরে প্রীতি-ভোজনের ঘটা চলিয়াছিল। জিন্দা তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন, সহসা দ্বার-প্রান্তে যেন কাহার ছায়া লুকাইতে দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ হইল। কাহাকেও কিছু না বলিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বাহিরে চলিলেন।

তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া ছায়াও সরিয়া গেল, জিন্দা সন্দিগ্ধ মনে তাহার অনুসরণ করিলেন। কিন্তু কিছুদূর না যাইতেই সহসা অন্ধকারের ভিতর হইতে একটা ভীষণ বল্লাম আসিয়া এমন ভাবে বুকে বিঁধিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ সেইখানে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। ছায়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল।

জিন্দা যে কখন উঠিয়া গিয়াছিলেন তাহা সোরাব জানিতে পারে নাই, হঠাৎ শূন্য আসনে দৃষ্টি পড়িয়া আশ্চর্য্য হইল এবং তাঁহার অন্বেষণের জন্য তৎক্ষণাৎ অনুচর পাঠাইল। তাহারা শিবিরের অনতিদূরে তাঁহার মৃতদেহ দেখিয়া আসিয়া যখন সেই সংবাদ প্রদান করিল, তখন সোরাব শোকে জ্ঞানহারার প্রায় হইয়া ভাবিল যে, দুষ্ট 'কাইকুস' গুপ্তচর পাঠাইয়া কোন কৌশলে তাঁহাকে হত্যা করিয়াছে। এবং তৎক্ষণাৎ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া 'কাইকুস'কে প্রতিশোধ দিবার জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিল।

সারি সারি ইরাণীদের শিবির পড়িয়াছিল। স্বয়ং বাদশা পর্য্যন্ত রুস্তামের বীরত্ব দেখিবার জন্য রণক্ষেত্রের প্রান্তে আসিয়া শিবির পাতিয়াছিলেন। সকাল হইতেই সোরাব বন্দী হুজীরকে সঙ্গে করিয়া একটা উচ্চস্থানে গিয়া উঠিল এবং কোন্ শিবির কাহার তাহা জানিতে চাহিল। হুজীর বাদশার শিবির হইতে আরম্ভ করিয়া একে একে অনেকগুলি বীরের শিবির চিনাইয়া দিল, কিন্তু রুস্তামের নামও মুখে আনিল না। সোরাবের সন্দেহ হইল যে সে মিথ্যা বলিতেছে, একটা প্রকাণ্ড, সবুজবর্ণ, জাঁকজমকে পরিপূর্ণ শিবিরের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—

"ওই শিবির কি বীরবর রুস্তামের নয় ?"

হুজীর মনে ভাবিল যে, যুবক বীর যখন প্রথম হইতে রুস্তামের শিবির চিনিবার জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছে, তখন নিশ্চয় মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে। হয়তো বা সহসা অতর্কিত অবস্থায় গিয়া তাঁহাকে গোপনে হত্যা করিবে। রুস্তামকে হারাইলে ইরাণের যে সকল আশা ভরসা লোপ পাইবে তাহা সে জানিত, সুতরাং মিথ্যা বলিল—

"না, উহা বীর রুস্তামের শিবির নয় ?"

"সত্য বল, তবে কোন্ শিবির তাঁহার ?"

"রুস্তামের শিবির তো দেখিতেছি না—তিনি সম্ভবতঃ এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।"

"অসম্ভব ! আমি আমার মায়ের নিকটে তাঁহার শিবিরের

যেরূপ বর্ণনা শুনিয়াছি, তা' ঠিক ওই সবুজ শিবিরের সঙ্গে মিলিয়া যায়।"

"হাঁ, তা সত্য কথা, রুস্তামের শিবির ঠিক ওই রকম সবুজ বর্ণই বটে, কিন্তু ও শিবির নয়।"

"সত্য বল—নহিলে এখনই তোমাকে বধ করিব।"

"আমি আপনার বন্দী—যা ইচ্ছা করিতে পারেন, সে ভয়ে মিথ্যা বলিব কেন—রুস্তাম এখনো আসেন নাই, নচেৎ তাঁহার শিবির দেখিতে পাইতাম।"

সোরাব নিরাশ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। হুজীর যে মিথ্যা বলিয়াছে তাহা মনে ভাবিতে পারিল না, রুস্তাম আসেন নাই বিশ্বাস করিয়া ম্লানমুখে চলিয়া গেল। কিন্তু তাহার অন্তরে জিন্দার হত্যা কাহিনী জাগিতেছিল, আর বিলম্ব সহিল না—একেবারে ঘোড়া ছুটাইয়া বাদশার শিবিরের দিকে চলিল।

ইরাণের অনেক বড় বড় যোদ্ধা বাদশার শিবির রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু রুস্তাম ছিলেন না। প্রথম দিন অন্য যোদ্ধাকে পাঠাইয়া, পরে নিজে যাইবেন, এবং ছদ্মবেশে ও ছদ্ম নামে যুবকের সহিত যুদ্ধ করিবেন স্থির করিয়া রুস্তাম নিজের শিবিরে বিশ্রাম করিতেছিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন যে এই বালকের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আমার কিছুমাত্র পৌরুষ নাই বরং কলঙ্ক আছে, লোকে বলিবে যে ইরাণে আর যোদ্ধা নাই তাই বীর রুস্তাম একটা তুচ্ছ বালকের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়াছে, সুতরাং নাম গোপন এবং ছদ্মবেশ ভিন্ন এ কালি মুছিবার উপায়

নাই। ঠিক সেই সময়ে বাদশার শিবিরের কাছে গোলমাল উঠিল।

সোরাব বাদশার শিবিরের নিকটে গিয়া 'কাইকুস'কে দেখিতে পাইল না, চীৎকার করিয়া তাঁহাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিল।

"এস, বাদশা কাইকুস, আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ কর, আমি তোমাকে রণে আহ্বান করিতেছি, নচেৎ তোমাকে ভীরু কাপুরুষ বলিয়া ডাকিব, শীঘ্র বাহির হইয়া যুদ্ধ দাও।"

কিন্তু বাদশার তো সাড়াশব্দ মিলিলই না—অধিকন্তু তাঁহার শিবিররক্ষক সৈন্যেরা সোরাবের স্পর্দ্ধা ও বিক্রম দেখিয়া সকলেই ভয়ে কাঁপিয়া যে কে কোথায় পলাইল তাহার ঠিকানা রহিল না। সমস্ত ইরাণী সৈন্যের ভিতরে একটা মহা আতঙ্কের আবির্ভাব হইয়া চারিদিক হইতে হাহাকার রোল উঠিল। সোরাব তাহা দেখিয়া ঘৃণার হাস্য হাসিয়া বাদশাকে কাপুরুষ বলিয়া কটু কহিতে লাগিল। তবু কেহ অগ্রসর হইল না। কাইকুস আতঙ্কে কাঁপিয়া অতি দ্রুত রুস্তামের নিকটে গুপ্ত দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত গিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল—

"শয়তান—সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার যুবকবেশে আসিয়াছে, কেউ তাহার সম্মুখে যাইতে সাহসী নহে, আপনি শীঘ্র আসুন।"

রুস্তাম চমৎকৃত হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—কে এ আশ্চর্য্য মহাশক্তিবান যুবক? ইরাণী সৈন্যদের এমন হুতাশ তো জীবনে কেহ কখনও দেখে নাই। কিন্তু তিনি আর বিলম্ব

করিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ সমরসাজে সাজিয়া 'রাক্‌সে' চড়িয়া বিদ্যুৎবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে তাঁহার ভ্রাতা সতর্ক করিয়া কহিল—

"ভাই, একাকী যাইয়া কায নাই—কে জানে কি ঘটিবে, যুবক সাধারণ নহে।"

রুস্তাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া এমন উপেক্ষার হাসি হাসিলেন যে, জহুর আর বাধা দিতে পারিল না। রুস্তামের মনে নাম গোপনের স্পৃহা বলবতী হইয়া উঠিল, তিনি দ্রুত অশ্বচালনা করিয়া সোরাবের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন—

"দুঃসাহসী যুবক, আমি তোমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতেছি, এস যুদ্ধ কর।"

"রুস্তামকে দেখিয়াই সোরাবের মন যেন কেমন হইয়া গেল, সর্ব্বাঙ্গ যেন পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, হৃদয়ে একটা অত্যন্ত প্রীতির ভাব জাগিয়া তাহাকে একেবারে মুগ্ধের মত করিয়া দিল, সে নির্নিমেষচক্ষে নীরবে তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। রুস্তাম ঘৃণাভরে হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"অমন করিয়া দেখিতেছ কি, যদি ভয় পাইয়া থাক বল—আমি বিনা যুদ্ধে তোমাকে ছাড়িয়া দিতেছি, হীন প্রাণ পলাইয়া রক্ষা কর, আর ইরাণের দিকে আসিও না।"

সোরাব গর্জ্জিয়া উঠিতে গেল, কিন্তু পারিল না, কণ্ঠস্বর যেন আপনা হইতেই কোমল—নম্র হইয়া আসিল, মনে মনে কি ভাবিয়া কহিল—

"না, ভয় কাহাকে বলে তা শিখি নাই, আসুন ওই নদীতীরে নিরালা প্রান্তরে আসুন।"

---

## দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

### পিতা-পুত্র

ইরাণ শিবির হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া পিতা-পুত্র যখন মুখোমুখী হইয়া দাঁড়াইল, তখন কেউ কাহাকেও আপনার সর্ব্বস্বধন—পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন বলিয়া চিনিতে পারিল না—হায়রে ভবিতব্য!

তবুও সোরাবের সেই কমনীয় তরুণ কান্তি দেখিয়া কে জানে—কোথা হইতে যে রুস্তামের মনে আপনা হইতেই একটু কোমলতা—একটু মায়া—একটুখানি অজ্ঞাত আকর্ষণ আসিতেছিল, তাহা তিনি কিছুতেই ঠেলিয়া রাখিতে না পারিয়া কোমল স্বরে কহিলেন—

"হায়, তরুণ যুবক, কেন তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ! তোমাকে যে এই হাতে হত্যা করিতে হইবে এ কথা মনে করিতেও আমার প্রাণ কাতর হইতেছে। তোমার তরুণ বয়স—পৃথিবীর কিছুই জাননা, আমি বৃদ্ধ রণ-পণ্ডিত, কত বার কত মহা মহা যুদ্ধে কত বড় বড় শক্তিশালী বীরকে বিনাশ করিয়াছি, আজ পর্য্যন্ত কেউ আমাকে হারাইতে পারে নাই। তোমার অঙ্গে আমার অস্ত্রাঘাত শোভা পায় না। যুদ্ধে কায নাই—

যাও ফিরিয়া যাও। বিশাল পৃথিবী তোমার সম্মুখে প্রসারিত রহিয়াছে, এ ঘাতকের বৃত্তি ছাড়িয়া তুরাণ পরিত্যাগ করিয়া যাও, যশে মণ্ডিত হইয়া পৃথিবীর রত্নরূপে পরিগণিত হইতে পারিবে। আর যদি ইচ্ছা কর, তোমার শৌর্য্য বীর্য্যের উপযুক্ত ক্ষেত্রে আমি তোমাকে স্থাপন করিয়া দিব, এ দুর্জ্জনদের সঙ্গ ছাড়িয়া যাও।"

রুস্তামের প্রত্যেক কথাটি ধারাল ছুরির মত সোবারের মর্ম্ম-স্থলে কাটিয়া বসিল, দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিতে চাহিল, কষ্টে সম্বরণ করিয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল—

"বীরবর আপনার মহত্ত্ব ও সহানুভূতি আমি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতেছি। একটা প্রশ্ন করিতে চাই, দয়া করিয়া সত্য উত্তর প্রদান করুন। আপনিই কি সেই ভুবনবিখ্যাত মহাবীর রুস্তাম? নহিলে এমন—"

বাধা পড়িল। প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ হইয়া পড়িলে পাছে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার অযোগ্য এই যুবকের কাছে সম্মানে খাটো হইয়া যাইতে হয়, এবং লোকনিন্দা ঘটে, সেই ভয়ে রুস্তাম তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"না, আমি রুস্তাম নই। তোমার মত বালক কি সেই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইবার যোগ্য পাত্র, যে, তিনি স্বয়ং যুদ্ধ করিতে আসিবেন, তাঁহার বীরত্বের কি মূল্য মর্য্যাদা নাই যে তাঁহার সঙ্গে যুঝিতে আশা করিয়াছ; ধন্য সাহস বটে! কিন্তু আমি রুস্তাম নই—তিনি আসেন নাই।"

একটা গভীর নিরাশার দীর্ঘনিশ্বাস উঠিয়া সোরাবের তরুণ হৃদয়খানি একেবারে যেন চুরমার করিয়া দিল। প্রথম সাক্ষাতে হৃদয়ের প্ররোচনায় যে আশা টুকু বুকে ধরিয়া সোরাব এই বৃদ্ধ যোদ্ধাকে নির্জ্জনে অহ্বান করিয়া আনিয়াছিল, তাঁহার নিজের মুখে তার বিপরীত উত্তর শুনিয়া আর হুজীরের কথায় সন্দেহ করিতে পারিল না। সোরাবের ক্ষুদ্র বুকখানি শতধা বিদীর্ণ হইয়া সকল আশা ঘুচিয়া গেল। সোরাব আর এই অপরিচিতের কাছে নিজের পরিচয় প্রদান করা আবশ্যক মনে করিল না। হায়রে ভবিতব্য !

তারপর যখন পিতা-পুত্রে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল তখন পিতা যেমন বুঝিলেন যে এই তরুণ যুবক সাধারণ নহে, পুত্রেরও তেমনি বুঝিতে বাকী রহিল না যে এই অজ্ঞাত বৃদ্ধ অদ্বিতীয় রণপণ্ডিত! আবার একটুখানি সন্দেহে সোরাবের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল—তাহার পিতাছাড়া তাহার সহিত এমন ভাবে এতক্ষণ যুঝিবার শক্তি আর কাহার আছে ? মুহূর্ত্তের অবসরে আবার আকুলভাবে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—

"বলুন, বলুন, সত্য বলুন—আপনি কি মহাবীর রুস্তাম ?"

যে কোমলতাটুকু রুস্তামের হৃদয়ে প্রথম দর্শনে আবির্ভূত হইয়াছিল, যুদ্ধের উত্তেজনায় যুবকের বীরত্বদর্শনে ঈর্ষায় তাহা অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছিল, রুক্ষস্বরে উত্তর করিলেন—

"না, না, রুস্তাম নই—যুদ্ধ কর—যুদ্ধ কর, কথায় আবশ্যক নাই, কার্য্যে বীরত্বের পরিচয় দাও।"

আবার সোরাব নিরাশ হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিল, কিন্তু এবার সে পরিচয় এমন করিয়াই দিল যে, রুস্তামের জীবনে আর কখনও তিনি কাহারও কাছে তেমন পরিচয় পান নাই। সারাদিন ধরিয়া দুইজনে দুই পরাক্রান্ত সিংহের মত অদ্ভুত যুদ্ধ করিল, তারপর দিবাবসানের সঙ্গে সঙ্গে সোরাবের আঘাতে রুস্তাম ক্ষণকালের জন্য অবসন্ন হইয়া ভূমিতে লুটাইল। সোরাব তৎক্ষণাৎ অস্ত্র সম্বরণ করিয়া কহিল—

"সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছে, আজ এই পর্য্যন্ত। যান বীরবর, আজ গিয়া বিশ্রাম করিয়া সুস্থ হউন, আমি শ্রান্ত না হইলেও আপনি অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছেন সুতরাং আজ আর যুদ্ধ করিব না। যদি ইচ্ছা করেন, দয়া করিয়া কাল আবার আসিবেন—আমন্ত্রণ করিয়া রাখিলাম।"

বলিয়া সোরাব বিনীতভাবে বিদায় গ্রহণ করিয়া শিবিরে ফিরিয়া গেলেন। যুবকের কাছে যুদ্ধে অপমানিত হইয়া চির-বিজয়ী রুস্তামের হৃদয় অপমানের আগুনে দগ্ধ হইলেও সোরাবের বীরত্বে মুগ্ধ ও চমৎকৃত না হইয়া পারিলেন না, আবার মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—'কে এ অদ্ভুত শক্তিশালী পরম্ রণ-পণ্ডিত যুবক, কেন বার বার রুস্তামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে?' কিন্তু তবুও দাম্ভিক বীর আপনার পরিচয় অজ্ঞাত রাখিবার সংকল্প দৃঢ় রাখিল। হায়—নির্ম্মম দৈব!

সারারাত্রি সোরাবের নিদ্রা আসিল না, বৃদ্ধ যোদ্ধার অপরিমেয় পরাক্রম, অদ্ভুত রণ-কৌশল, মৃগের ন্যায় লঘু চঞ্চল গতি, অবিরত

মনে উঠিয়া, তাহার অন্তরকে নিরন্তর বৃদ্ধের প্রতিই আকর্ষিত করিতে লাগিল। অজ্ঞাতে হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধাভক্তি-ভালবাসা একত্রে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাহারই চরণমূলে আত্মনিবেদন করিয়া দিতে ছুটিল। প্রত্যুষে উঠিয়া 'হুমান'কে জিজ্ঞাসা করিল—

"সত্য বল হুমান, কাল যাহার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, এবং আজ আবার এখনি যুদ্ধ করিতে যাইব—তিনিই কি দেশবিখ্যাত ইরাণী বীর রুস্তাম ?"

আফ্রিজিয়াবের আদেশ হুমান বিস্মৃত হয় নাই, মনোভাব গোপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—

"কেন, বলুন দেখি ?"

"কাল বরম্বার জিজ্ঞাসা করিয়াও পরিচয় পাইলাম না।

"কিন্তু আমার মনে হইতেছে আমি বালক বলিয়া—লজ্জায় তিনি আত্মপরিচয় গোপন করিয়াছেন। রুস্তাম ভিন্ন এমন অদ্ভুত পরাক্রম ইরাণে আর কাহার আছে ? সত্য বল—তিনিই কি মহাবীর রুস্তাম ? তোমরা তো বহুবার তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছ ?"

"বহুবার দেখিয়াছি ; ইনি রুস্তাম নহেন।"

"আশ্চর্য্য—তবে হুজীর মিথ্যা বলে নাই ?"

"না, শুনিয়াছি রুস্তাম এখনো জাবুলীস্থান হইতে আসিয়া পৌঁছান নাই। রুস্তাম আসিলে দেখিতেই পাইবেন।"

সোরাব আর কিছু না বলিয়া আবার যুদ্ধ যাত্রা করিল। কিন্তু রণস্থলে গিয়া রুস্তামকে দূর হইতে দেখিয়াই আবার তাহার

সারাটি হৃদয় আকুল হইয়া উঠিল। প্রাণের ভিতর এমন একটা আবেগ সাগর-তরঙ্গের মত নাচিয়া উঠিল যে, সে কিছুতেই তাহার বেগ দমন করিতে পারিল না, স্নেহভাজন পরমাত্মীয়ের মত তাড়াতাড়ি রুস্তামের কাছে গিয়া মিনতিপূর্ণ বিনীতস্বরে কহিল—

"আসুন, আসুন, আর আমরা যুদ্ধ করিব না, আপনার দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়া অত্যন্ত অনুতাপ ভোগ করিয়াছি। সত্য বলুন আপনি বীরবর রুস্তাম কি না, রুস্তাম নহিলে এত পরাক্রম, এত শক্তি কার? দোহাই আপনার, প্রতারণা করিবেন না, অস্ত্র ফেলিয়া দিন—আজ পরস্পরে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইব, আর আমার যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা নাই, বলুন—বলুন আপনি বীরবর রুস্তাম কি না?"

বলিয়া সোরাব এমন কাতরনয়নে অজ্ঞাত পিতার মুখের পানে চাহিল যে, রুস্তামের হৃদয়ে তাহা সজোরে আঘাত করিয়া ব্যথা দিতে ছাড়িল না, কিন্তু পূর্ব্বদিনের অপমানবহ্নি তখনও ছাইচাপা আগুনের মত তাঁহার অন্তরে ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। সেই আগুন দ্বিগুণ জ্বালাইবার জন্য কি আত্মপরিচয় দিয়া তিনি অধিকতর অপমানকে বরণ করিয়া লইবেন? পরিচয় গোপন রাখিবার জন্য তাঁহার দৃঢ়তা আরও বাড়িল বই কমিল না। তিনি আপন সংকল্পে অটুট রহিয়া কহিলেন—

"মূর্খ যুবক, তুমি কি মিষ্ট কথায় মন ভুলাইয়া পরিত্রাণ পাইতে চাও? কিন্তু তোমার সে আশা মিটিবে না—আজ তোমাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়া বিদায় করিব। বারম্বার বলিয়াছি

আমি রুস্তাম নই, তবু বারম্বার সেই মহাবীরের নামে আমাকে তোষামোদ করিয়া ভুলাইতে চাও। ছিঃ! ছিঃ! ভীরু, কাপুরুষ, যুদ্ধ কর।”

রুস্তামের কথার সঙ্গে সঙ্গে যুবকের নিরাশা-পীড়িত হৃদয়ে তরল শোণিতস্রোত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, আর বাক্যব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ সে মল্ল-রণে মাতিল। সেদিনকার যুদ্ধ আরও কঠোর—আরও ঘোরতর হইয়া দাঁড়াইল, দূরে চিত্রপুত্তলিকার মত স্তব্ধ হইয়া উভয় দলের সৈন্যগণ দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল। অবশেষে সোরাব রুস্তামকে মাটীতে ফেলিয়া দিল। যুদ্ধরীতি অনুসারে সোরাব তাঁহার বুকে হাঁটু চাপিয়া বসিয়া মস্তক দ্বিখণ্ডিত করিত কিন্তু আবার সেই করুণভাব মনে উদিত হইয়া তাহাকে সে কার্য্যে বাধা দিল। সোরাব মন্ত্রমুগ্ধবৎ দাঁড়াইয়া রহিল। রুস্তাম চকিতে উঠিয়া কহিল—“যুবক আজ এই পর্য্যন্ত—কল্যকার যুদ্ধ শেষ যুদ্ধ জানিবে।” সোরাব তাহাতেই সম্মত হইল।

---

## ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

### ভাগ্যলিপি

সে দিনেও অপমানের কালিমা মুখে মাখিয়া দেশবিখ্যাত রুস্তাম বীর আপনার শিবিরে ফিরিলেন, আর তুরাণীগণের জয়ধ্বনিতে সমগ্র শিবির কম্পিত হইতে লাগিল। রুস্তামের মুখের ভাব দেখিয়া কি বাদশা ‘কাইকুস’, কি তাঁহার স্বপক্ষীয়

প্রিয় সৈন্যগণ—কেহই কাছে ঘেঁসিতে সাহস করিল না। রুস্তাম ইঙ্গিতে কেবলমাত্র তাঁহার ভ্রাতা জহুরকে ডাকিয়া লইয়া আপন শিবিরে প্রবেশ করিলেন এবং অন্যের অগোচরে কহিলেন—

"ভাই—বুঝিতে পারিতেছি না—কে এই ভীমবিক্রম যুবক-বীর আমার গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে আসিয়াছে! মনে হয়—আমার যদি কন্যা না হইয়া একটি পুত্রসন্তান হইত—তা' হইলে সেও ঠিক এমনি বীরকুল-চূড়ামণি হইয়া উঠিত, কিন্তু সে আশা বৃথা—তামিনা কেন আমার কাছে মিথ্যা সংবাদ পাঠাইবে, পুত্র জন্মিলে সে সর্ব্বাগ্রে সেই আনন্দসংবাদ না দিয়া থাকিতে পারিত না, কিন্তু তবুও—কেন জানি না—যুবককে দেখিলে হৃদয়ে কেমন এক অজ্ঞাত আনন্দের সঞ্চার হয়, তাহার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে হাত যেন অবশ হইয়া পড়ে—কে জানে এ কোন্ যাদুকর! আজ পর্য্যন্ত যে বিজয়ী রুস্তামের গর্ব্বকে কেহ একবিন্দু ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই—সেই আমি ক্রমাগত দুই দিন বালকের রণে হটিয়াছি, জানি না কাল ভাগ্যে আবার কি ঘটিবে! শুন ভাই—আমাদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের কাল মীমাংসা হইবে, যদি জয়ী হই তো কথাই নাই, কিন্তু সে আশা আর মনে স্থান দিতে প্যারি না। যদি ভাগ্যে বিপরীত ঘটে, তবে তুমি আমার সমস্ত সৈন্য লইয়া অবিলম্বে দেশে ফিরিয়া যাইও—এ যুদ্ধে আর কোন সংশ্রব রাখিও না, অকৃতজ্ঞ 'কাইকুস' তাঁহার নিজের কার্য্য নিজে করিবেন, না পারেন—ফল ভুগিবেন। বুঝিতেছি—তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের কাল নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে।"

এই বলিয়া ভ্রাতাকে বিদায় দিয়া রুস্তাম বিশ্রামে মনোযোগ দিলেন, কিন্তু হায় বিশ্রাম তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। সেই নির্জ্জন মুহূর্ত্তে সোরাবের মুখচ্ছবির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অদ্ভুত পরাক্রমের চিত্রগুলি ক্রমাগত তাঁহার হৃদয়পট ছাইয়া ফেলিতে লাগিল, তিনি আর এক পলের জন্যও সোরাবের চিন্তাকে অন্তর হইতে বিদায় দিতে পারিলেন না। তুরাণীগণের শিবির হইতে ঘন ঘন জয়োল্লাসের ধ্বনি উঠিয়া সেই চিত্রকে যেন জীবন্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

এদিকে তুরাণীদের শিবিরে অফুরন্ত জয়োল্লাসের ভিতরেও বাদশা 'আফ্রিজিয়াবের' অনুচর 'হুমান' ও 'বার্ম্মাণের' ভাবনার অবধি ছিল না। উপর্য্যুপরি দুইদিন যুদ্ধে রুস্তামকে দুইবার দুই-প্রকারে পরাজিত করিয়াও সোরাব যখন মহত্ত্ব ও উদারতা গুণে মুক্তি দিয়া আসিয়াছিল—তদবধি তাহাদের চিন্তার বিরাম ছিল না। যদি কোন সূত্রে—পরদিনের যুদ্ধে—শেষ মুহূর্ত্তেও পিতা-পুত্রের পরিচয় প্রকাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে পরিণাম যে কি হইবে সেই কথা ভাবিয়া এবং বাদশার আদেশ স্মরণ করিয়া উভয়ে অবিরত সোরাবকে রুস্তামের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল।

কিন্তু তাহাদের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়া গেল। পিতার কোন প্রকার উদ্দেশ করিতে না পারিয়া, সোরাব এমন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল যে, আর তাহার কোন বিষয়ে কিছুমাত্র উৎসাহ ছিল না, জীবন যেন অসহনীয় ভার বোধ হইয়া সকল ব্যাপারেই

তাহাকে উদাসীন করিয়া দিয়াছিল। যতবার সেই প্রবীণ প্রতিদ্বন্দ্বী বীরের কথা মনে উঠিতেছিল, ততই তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল তেজ, গর্ব্ব, বীর্য্য যেন নির্ব্বাপিত হইয়া—একটা অজ্ঞাত স্নেহের আকর্ষণে তাহাকে কেবলই তাহার দিকে ক্রমাগত টানিতেছিল।

হায়, যদি সে পিতার পরিচয় পাইত! যদি রুস্তাম বীরত্বের অহঙ্কারে অন্ধ না হইয়া পরিচয় প্রকাশ করিতেন অথবা সোরাবও যদি একবার কোন সূত্রে মুখ ফুটিয়া নিজের পরিচয় বলিয়া ফেলিত! তা' হইলে সোরাবের মত সুখী বোধ করি পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় থাকিত না। কিন্তু হায়! ভাগ্যলিপি কে খণ্ডন করিবে?

তেমনি মনের গুরুভার লইয়া সোরাব যখন—পরদিন—অজ্ঞাত পিতার সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধে নামিল, তখন তাহার মনে আর হার-জিতের কোন কামনাই ছিল না, তবুও অভ্যাস তাহার উদাসীন শক্তিকে দৃঢ় করিয়া দিল। কিন্তু মন মানিল না, চুম্বুক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে, তেমনি একটা অজ্ঞাত শক্তি তাহার তরুণ হৃদয়কে অজ্ঞাত প্রতিদ্বন্দ্বীর দিকে টানিতে লাগিল। অস্ত্রে হাত দিবার পূর্ব্বে সে যেন বিহ্বলের মত ক্ষণকাল রুস্তামের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া আবার সেই প্রশ্ন করিল—

"সত্য বলুন—আপনি কি বীরবর রুস্তাম নহেন, দোহাই আপনার—বালকের সঙ্গে ছলনা করিবেন না। জানি না—

আপনাকে দেখিয়া অবধি কেন আমার মন এমন হইয়াছে, আপনাকে কিছুতেই শত্রু বলিয়া মনে করিতে পারি না, আপনাকে পর ভাবিতেও প্রাণ যেন আমার কাঁদিয়া উঠে। কায নাই যুদ্ধে—আসুন আমরা অস্ত্র ফেলিয়া দিয়া পরস্পর স্নেহে আবদ্ধ হই। বলুন—বলুন—আমার অনুমান সত্য কি না, আপনি দেশপূজ্য মহাবীর রুস্তাম কি না ?”

শেষ কথাগুলি বলিতে বলিতে সোরাবের কণ্ঠস্বর বাধিয়া আসিল, চোখ দু'টি ছল ছল করিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তের জন্য তাহার মুখের পানে চাহিয়া রুস্তামেরও মন একবার টলিল, কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন—আমার পরিচয় পাইলে যুবক যুদ্ধ তো করিবেই না, বরং উপহার দানে আমাকে তুষ্ট করিয়া নিবৃত্ত করিবে। তার পর দেশে ফিরিয়া গিয়া গর্ব্বভরে রটাইবে যে—ইরাণের সমস্ত বড় বড় নামজাদা যোদ্ধাগণকে আমি দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলাম, কিন্তু একমাত্র বীর রুস্তাম ছাড়া আর কেউ ভরসা করিয়া অগ্রসর হয় নাই, এবং আমরা দুইজনে পরস্পর পরস্পরকে ঠিক সমান বলিয়া—উভয়ে প্রীতি-উপহার বিনিময় করিয়া বন্ধুত্ব করিয়া আসিয়াছি।

কথাটা মনে হইতেই রুস্তামের হৃদয় কঠোর হইয়া উঠিল, দৃঢ়—কর্কশ কণ্ঠে ধমক দিয়া কহিলেন—

“না, না—বার বার বলিয়াছি আমি রুস্তাম নহি, তুমি ইরাণের যোদ্ধাদেরে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছ—আমি সে আহ্বান গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি—যুদ্ধ কর। তুমি কি শুধু রুস্তামের

সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া আসিয়াছ? দুঃসাহসী বালক—রুস্তামকৈ দেখিবামাত্র অতিবড় পরাক্রমশালী যোদ্ধারও হাতের অসি খসিয়া পড়ে, ঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্ররাশির মত—রুস্তামের সম্মুখে শত্রুপক্ষ চোখের পলকে উড়িয়া যায়। আজ যদি রুস্তাম আসিত, তা' হইলে তোমার মুখে আর যুদ্ধের কথা বাহির হইত না। কিন্তু আমি—যা, সেই ভাবেই বলিতেছি যে এখনও তুমি হারমানিয়া ফিরিয়া যাও—নচেৎ এই প্রান্তরের শুষ্ক বালুকারাশি তোমার উষ্ণ রক্তে সিক্ত হইতে আজ আর বাকী থাকিবে না।"

সোরাবের আর সহ্য হইল না, দুই দিন হটিয়াও যে গর্ব্বিত প্রতিদ্বন্দ্বী তাহার পরাক্রমকে এমনভাবে অগ্রাহ্য করিল, তাহার প্রতি হৃদয়ের সকল কোমলতাই মুহূর্ত্তে অদৃশ্য হইয়া গেল, সে রুক্ষস্বরে কহিল—

"গর্ব্বিত বৃদ্ধ, দুই দিনের যুদ্ধে কি আমার শক্তির পরিচয় পাইতে তোমার বাকী আছে—তবে বালক বলিয়া উপহাস করিতেছ কেন? তেমন ধাতুতে আমার প্রকৃতি গঠিত নহে, তাহার পরিচয় এখনো না পাইয়া থাক তো আজ ভাল করিয়াই পাইবে। কিন্তু একটা কথা সত্য বলিয়াছ, যদি বীরবর রুস্তাম উপস্থিত হইতেন তা' হইলে যে যুদ্ধের নাম মুখে আনিতাম না—সে কথা নিশ্চয়। কিন্তু আমার ভাগ্যদোষে তিনি এখন এখান হইতে বহুদূরে জাবুলীস্থানে রহিয়াছেন, এ যুদ্ধের মীমাংসা আজ তোমায়-আমায় এই স্থানে হইয়া যাইবে। তবে প্রস্তুত হও!

তুমি বীর্য্যে ও আকৃতিতে আমার অপেক্ষা বহুগুণে উচ্চ ; আমি বালকমাত্র, যুদ্ধের অভিজ্ঞতাতেও তোমার সমকক্ষ নই ; তবুও স্মরণ রাখিও বৃদ্ধ, জয়-পরাজয় কাহারও ইচ্ছাধীন নহে। যে জয়ের আশায় নিশ্চিত হইয়া এরূপ গর্ব্ব করিতেছ, নিয়তি আজ তাহা কোন্ পথে চালিত করিবে তাহা কি ঠিক বলিতে পার ?"

রুস্তাম আর সে কথার জবাব করিলেন না, চক্ষের নিমিষে বাঘের মত লাফাইয়া সোরাবের উপরে গিয়া পড়িলেন। যুদ্ধ-বিশারদ সোরাবও তজ্জন্য প্রস্তুত ছিল। মুহূর্ত্তের ভিতরে দুইজনে ঘোরতর মল্লরণ আরম্ভ হইয়া গেল। উভয় পক্ষের সৈন্যগণ দূরে দাঁড়াইয়া স্তব্ধ হইয়া—উভয়ের সে দিনের সেই ভীষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিল।

কিন্তু বহুক্ষণেও যুদ্ধের মীমাংসা হইল না। রণরঙ্গে সোরাবের উদাস হৃদয়ের শোণিতরাশি বিষম উত্তপ্ত হইয়া এমন সিংহ-বিক্রম আনিয়া দিল যে, রুস্তাম শুধুই যে যুবকের সে দিনের দুর্দ্ধর্ষ পরাক্রম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এমন নয়, তাঁহার হৃদয় হইতে জয়ের আশা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল। আর যতই তিনি আপনার অক্ষমতা অনুভব করিতে লাগিলেন, ততই মনে মনে যুবকের প্রতি আরও কঠোর—আরও নির্ম্মম হইয়া ভীষণতর হইতে লাগিলেন।

কিন্তু বহুক্ষণেও কেহ কাহাকেও পরাস্ত করিতে পারিল না। সহসা সোরাব যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া—কম্পিতকায় ঘর্ম্মাক্ত রুস্তামকে পুনরায় কহিল—

"তুমি পরম যুদ্ধবিশারদ প্রকৃত বীর বটে! আমি বালক হইলেও বহুবার বহু পরাক্রমশালী যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু এমন অদ্ভুত বীর্য্য আর কাহারও দেখি নাই। তুমি রুস্তাম নও বলিতেছ, কিন্তু যে হও আর যুদ্ধে কায নাই, ক্রোধ সম্বরণ কর। কে জানে কেন আমি কিছুতেই তোমার প্রতি রুষ্ট হইতে পারিতেছি না, যতই তোমার পানে চাহিতেছি তোমার অঙ্গে আমার অঙ্গ স্পর্শ হইতেছে ততই আমার হৃদয় অধীর হইয়া তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে—কিছুতেই তোমার অঙ্গে আঘাত করিতে পারিতেছি না। কে তুমি ওহোঃ—কে তুমি আমার হৃদয়ে এমন আধিপত্য বিস্তার করিয়া ফেলিতেছ, ঈশ্বরের এ কি নির্দ্দেশ! ক্ষান্ত হও—যুদ্ধে কায নাই, এস আমরা সন্ধি করিয়া পরস্পর বন্ধুত্ব-সূত্রে বদ্ধ হই। তুমি ইরাণের একজন শ্রেষ্ঠ বীর, নিশ্চয়ই বহুবার বীরবর রুস্তামকে দেখিয়াছ—বহুবার তাঁহার পাশে দাঁড়াইয়া একসঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছ—তাঁহার বহু বীর্য্য বিক্রম, কীর্ত্তি কাহিনীর বিষয় অবগত আছ, আমাকে সেই সকল কথা বল, বীরবর রুস্তামের গল্প শুনাও।"

একটা গভীর নিরাশার দীর্ঘশ্বাস সোরাবের শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া বাতাসে মিশিয়া গেল। কিন্তু রুস্তাম তাহা লক্ষ্য করিলেন না। বীরত্বের গর্ব্বে বারম্বার আঘাত পাইয়া দিগ্বিজয়ী বীর উন্মত্তের মত হইয়া উঠিয়াছিলেন, ক্রোধে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, দন্তে দন্তে ঘর্ষিত হইয়া বাকশক্তি রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিল, চক্ষুদ্বয় হইতে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছুটিয়া বাহির

হইতেছিল, বক্ষস্থল সাগর-তরঙ্গের মত—ঘন ঘন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ও ধূলায় কর্দ্দমাক্ত হইয়া ভীষণকায় দৈত্যের মত দেখাইতেছিল। ক্ষণকাল ভীষণ রোষ-রক্তিম অগ্নি-ময় দৃষ্টিতে সোরাবের পানে চাহিয়া চাহিয়া রুস্তাম সহসা ক্ষুধার্ত্ত সিংহের মত ভীষণস্বরে গর্জ্জিয়া উঠিলেন—

"ভীরু—কাপুরুষ—বালিকাস্বভাবসম্পন্ন যুবক, এ তোমার তুরাণের বাদশা 'আফ্রিজিয়াবের' ক্রীড়াকানন নহে যে মিষ্ট কথায় নর্ত্তকীদের মন ভুলাইবে, স্মরণ রাখিও এস্থল ইরাণের যুদ্ধক্ষেত্র। এই পরিণত বয়সে আমি তোমার মিষ্ট কথায় ভুলিয়া খেলা করিতে আসি নাই। যুদ্ধকর—আত্মরক্ষায় মনোযোগী হও, এবার তোমার আর নিস্তার নাই, তোমার মিষ্ট কথার সঙ্গে সঙ্গে চাতুরীর অভিনয় শেষ করিয়া দিতেছি।"

বলিয়াই রুস্তাম উন্মত্তের মত আবার সোরাবের উপরে গিয়া পড়িলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও সোরাবকে বাধ্য হইয়া আবার যুদ্ধে মাতিতে হইল। আবার উভয়ে ঘোরতর সংগ্রাম বাধিয়া গেল। দূরে দাঁড়াইয়া উভয় পক্ষের সৈন্যগণ রুদ্ধনিশ্বাসে সেই দুই অসমান প্রতিদ্বন্দ্বীর অস্বাভাবিক যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। আকাশ হইতে দেবতারাও বুঝিবা এবার পিতা-পুত্রের সেই অস্বা-ভাবিক বণরঙ্গ দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া লইলেন। সহসা রণস্থলের উপরিভাগে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া গেল, আচম্বিতে একটা প্রবল ঘূর্ণী বাতাস উঠিয়া নদীতীরের বালুকারাশি উড়াইয়া উভয়ের চারিদিকে এমন নিবিড়ভাবে আচ্ছন্ন করিয়া দিল যে, দূরস্থিত

দর্শকগণের চক্ষে যোদ্ধাদ্বয় একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। সেই ঘনধূলিসমাচ্ছন্ন নিবিড় অন্ধকারের ভিতরে অজ্ঞাত পিতাপুত্র—রক্তলোলুপ শার্দ্দূলের মত—পরস্পরের বক্ষরক্ত পানের তৃষায় উন্মত্ত হইয়া ভীষণ রণরঙ্গে মাতিয়া রহিল। আর কেবল মাত্র রুস্তামের প্রিয় অশ্ব 'রাক্স্' প্রভুর অদূরে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া—অপলকনেত্রে সেই অস্বাভাবিক ব্যাপার নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সহসা বায়ুতরঙ্গে বজ্রনাদ শ্রুত হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে 'রাক্স্' এমন ভীষণ, অস্বাভাবিক, তীব্র চীৎকার করিয়া উঠিল যে তাহা অশ্বের হ্রেষার মত শুনাইল না। দূরস্থিত উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণই সেই তমসাচ্ছন্ন অদৃশ্য অশ্বের বিকট ধ্বনিতে আচম্বিতে মহাভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। আর সেই মুহূর্ত্তে বিমনা সোরাবকে সহসা অতর্কিতে নীচে ফেলিয়াই রুস্তাম তাহার বক্ষদেশে এক বিষম ধারাল প্রকাণ্ড ছোরা আমূল বসাইয়া দিয়াই পৈশাচিক উল্লাসে অট্টহাসি হাসিয়া উঠিলেন।

হায়—নির্ম্মম ভাগ্যলিপি!

---

## চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

### অবসান

হতভাগ্য সোরাবের ভাগ্যলিপি পূর্ণ হইবার পরক্ষণেই প্রকৃতির বিপ্লবও থামিয়া গেল। আকাশের মেঘ কাটিয়া সূর্য্য

হাসিল, ঘূর্ণী বাতাস পড়িয়া গেল, ধূলার অন্ধকার অদৃশ্য হইল, প্রকৃতি যেন একটা বীভৎস অভিনয় দর্শনের পরে মনের ভার ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য জোর করিয়া হাসিল। উভয় পক্ষীয় দর্শক সৈন্যগণের হৃদয় এতক্ষণ উৎকণ্ঠায় আলোড়িত হইতেছিল, এতক্ষণের পরে সকলে রণস্থলের দৃশ্য দিবালোকে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইল।

রক্তাক্তকলেবরে সোরাব বালুকা-শয্যায় লুটাইয়া যাতনায় ছটফট করিতেছিল, আর সেই পরম পিতৃভক্ত, অজ্ঞাত পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া—'অজ্ঞাত পিতা—রুস্তাম' বিজয়গর্ব্বে হাসিতে হাসিতে পরাজিত মৃত্যু-শয্যাশায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীর সেই বিষম যাতনা নিশ্চিন্তমনে উপভোগ করিতেছিলেন। সেই দৃশ্য দেখিয়া তুরাণী সৈন্যগণের ভিতরে যেমন বিষাদের হাহাকার উঠিল, ইরাণী সৈন্যগণের জয়োল্লাস উঠিয়া তেমনি আকাশ বাতাস কাঁপাইতে লাগিল। পৈশাচিক আনন্দে পরিতৃপ্ত দৃষ্টিতে সোরাবের মুখের পানে চাহিতে চাহিতে রুস্তাম উল্লাসভরে কহিলেন—

"হায় সোরাব, তোমার মনে বড় সাধ ছিল যে ইরাণের একজন প্রধান ব্যক্তি এবং বিখ্যাত যোদ্ধাকে আজ বধ করিয়া তুমি 'আফ্রিজিয়াবের' শিবিরে উচ্চ সম্মান লাভ করিবে, অথবা হয়ত মনে মনে এই দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়াছিলে যে, দেশ-বিখ্যাত মহাবীর রুস্তামকে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে পাইয়া, মিষ্ট কথায় এবং উপহার প্রদানে তাঁহাকে ভুলাইয়া যুদ্ধে নিরস্ত করিবে, তারপর দেশে ফিরিয়া গিয়া কহিবে যে ইরাণের কোন

যোদ্ধা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে সাহস করে নাই, শেষে স্বয়ং মহাবীর রুস্তাম উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী জ্ঞানে অগ্রসর হইয়াছিল কিন্তু বীর্য্যে, পরাক্রমে ও রণবিদ্যায় উভয়ে সমকক্ষ বলিয়া রুস্তামের আগ্রহে পরস্পরে সন্ধি স্থাপন করিয়া আসিয়াছি। হাঃ হাঃ হাঃ সে গর্ব্ব উপভোগ করা তোমার ভাগ্যে নিশ্চিত আছে মনে ভাবিয়াছিলে! সে রটনায় তোমার নাম গৌরবে মণ্ডিত হইয়া সমগ্র দেশবাসীর মুখে মুখে ফিরিবে! তোমার বৃদ্ধ .পিতা মাতা তোমার গৌরবে তাঁহাদের বার্দ্ধক্যে সম্মান ও শ্রদ্ধার উচ্চশিখরে উঠিবেন! শত শত উচ্চবংশীয়া সুন্দরী রমণী তোমাকে পতি লাভের জন্য লালায়িত হইবে! হায় মূর্খ—সে দুরাশা এখন তোমার রহিল কোথায়? আজ যে এই অজ্ঞাত বিদেশে—অজ্ঞাত যোদ্ধার হস্তে নিহত হইয়া তুমি যে তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতা এবং দেশবাসীর প্রিয়তর হইবার পরিবর্ত্তে শৃগাল ও শকুনি গৃধিনীগণের প্রিয়তম হইয়া পড়িলে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—”

রুস্তামের মর্ম্মান্তিক শ্লেষবাক্যগুলি শত শত তপ্ত শলাকার মত সোরাবের হৃদয়ে বিদ্ধ হইল, সে উত্তেজিতভাবে জবাব করিল—

“হায়রে দাম্ভিক অজ্ঞাত বৃদ্ধ, তোমার এ আনন্দ—এ গর্ব্ব সমস্তই বৃথা, তোমার কি শক্তি যে আমাকে বধ কর? তুমি আমাকে বধ কর নাই—আমাকে বধ করিয়াছেন সেই দেশপূজ্য মহাবীর রুস্তাম! শুন বৃদ্ধ, যুদ্ধে আসিবার কালে আমি যে সোরাব ছিলাম—আজ যদি আমি সেই সোরাব থাকিতাম, তা’

হইলে তোমার মত দশজন বীর এক সঙ্গে আমার একার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেও—আমি তোমাদের দশ জনকেই এইখানে এমনি নিহত করিয়া, আজ তোমার মতই অমনি বিজয়গর্ব্বে হাসিতে পারিতাম। কিন্তু, হায়—ভবিতব্য! সেই রুস্তাম—রুস্তাম—সেই আমার চিরপূজ্য, প্রিয়তম দেবতার নামই আমার সকল বল হরণ করিয়া লইয়াছিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে তোমার ভিতরেও কি জানি কেমন একটু কিছু ছিল যাহাতে আমি আদৌ যুদ্ধে মনোযোগ দিতে পারি নাই। তোমার অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিতে আমার মুষ্টি আপনা হইতেই শিথিল হইয়া আসিতেছিল, তোমার অঙ্গস্পর্শে আমার যুদ্ধের সাধ একেবারে বিলুপ্ত হইয়া সারা হৃদয় কেবলই আনন্দে আপ্লুত হইতেছিল, তোমার মুখের পানে চাহিয়া—তোমার কঠোর রুষ্ট ভাষা শুনিয়াও আমার মনে মুহূর্ত্তের জন্য ক্রোধ বা উত্তেজনা আসে নাই, বরং তোমার কণ্ঠস্বরে বারম্বার আমার সর্ব্বাঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইতেছিল। এ কথা তোমাকে আমি বারম্বার অকপটে বলিয়াছি। আমি কি তোমার সহিত যুদ্ধ করিয়াছি ভাবিয়াছ? তুমি একজন নিরস্ত্র বালককে নিষ্ঠুর ভাবে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়া, গর্ব্বে মাতিয়া আমার দুরদৃষ্টকে ব্যঙ্গ করিতেছ, কিন্তু শুন—প্রস্তুত হও গর্ব্বিত বৃদ্ধ, তোমার এ ঘৃণিত নৃশংস অন্যায় কার্য্যের প্রায়শ্চিত্তের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাক! যা বলিতেছি তা' শুনিলে এখনি তোমার আপাদমস্তক আতঙ্কে কম্পিত হইবে—সমস্ত বৃথা গর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিলুপ্ত হইবে। আবার বলি, শুন দাম্ভিক প্রস্তুত থাক—ভুবনবিজয়ী মহাবীর

রুস্তাম আমার অন্যায় হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন। আমার পূজ্যপাদ পিতা তাঁর প্রিয়তম পুত্রের হত্যাকারীকে জীবন্তে নিষ্কৃতি দিবেন না। তিনি যখন শুনিবেন যে তাঁহারই অন্বেষণে আসিয়া এখানে আমি তোমার দ্বারা নিহত হইয়াছি, তখন রুস্তামের সে ভয়াবহ ক্রোধাগ্নির মুখে কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে তাহার উপায় চিন্তা কর। পৃথিবী কি ছার—আকাশে পলাইলেও পিতা আমার তোমাকে সেখান হইতে টানিয়া আনিবেন, পাতালে প্রবেশ করিলেও রুস্তামের হস্তে রক্ষা পাইবে না—”

সোরাব হাঁফাইতে হাঁফাইতে থামিল। তাহার কথাগুলি শুনিয়া রুস্তাম কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—মুখে চোখে একটা অস্বাভাবিক ভাব ক্রীড়া করিতেছিল—বিস্ফারিত চোখে একটা অনিশ্চিত জ্যোতি—খদ্যোতের মত—একবার প্রদীপ্ত, একবার নির্ব্বাপিত হইতেছিল। মুহূর্ত্তকাল সোরাবের পাণ্ডুবর্ণ মুখের পানে চাহিয়া শিথিলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—

“কেন—কেন—রুস্তামের সঙ্গে কার কি পিতাপুত্রের সম্বন্ধ—কি জন্য—কিসের প্রতিশোধ—রুস্তামের তো—পুত্র—পুত্র নাই!—না—কখনো ছিল না!”

বলিতে বলিতে রুস্তামের কণ্ঠস্বর যে কাঁপিয়া রুদ্ধ হইয়া গেল, সোরাব তাহা বুঝিতে পারিয়াও লক্ষ্য করিল না, অকম্পিত, দৃঢ়স্বরে কহিল—

“হাঁ—হাঁ—ছিল—আছে, আমিই তাঁর সেই অজ্ঞাত পুত্র—তামিনা মায়ের একমাত্র সন্তান, তাঁহারই অন্বেষণের জন্য ইরাণে

আসিয়া তোমার হাতে প্রাণ দিলাম। জানি না তিনি এখন কোথায়,—কিন্তু একথা জানি যে, এ সংবাদ তাঁহার কর্ণে পোঁছিতে বিলম্ব হইবে না। তখন—তখন বৃদ্ধ, তাঁহার একমাত্র পুত্রের অকাল-মৃত্যুতে যে কি গুরু শোকভারে তাঁহার মস্তক নুইয়া পড়িবে —কি বেদনায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে—কি প্রলয়কারী ক্রোধে প্রতিশোধ লইবার স্পৃহা উদ্দাম হইয়া উঠিবে তা' কি বুঝিতে পারিতেছ ? হায়—তাঁর সে শোকে সান্ত্বনাদানের জন্য যদি কোন রকমে আমার এই বিদায়-উন্মুখ জীবন-প্রবাহকে ধরিয়া রাখিতে পারিতাম, তা হইলেও আপনাকে অশেষ সৌভাগ্যবান মনে করিতে পারিতাম। তবুও তাঁর জন্য আমার তত দুঃখ নাই—যত দুঃখ হইতেছে আমার অভাগিনী মায়ের জন্য। হায়—তাঁর যে আর সান্ত্বনার কোন সম্বল নাই—আমি যে অভাগিনী মায়ের একমাত্র বুকের ধন—নয়নের নিধি! আর তো তাঁর সে জীবনাধিক পুত্র ইরাণ হইতে যুদ্ধ জয় করিয়া গর্ব্বোন্নতশিরে তাঁর কাছে গিয়া দাঁড়াইবে না। প্রতি পলে যাহাকে দেখিবার জন্য অধীর উৎকণ্ঠায় তিনি পথ চাহিয়া রহিয়াছেন, আর তো তাহাকে দেখিতে পাইবেন না। আর তো কেউ তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিবে না। মা—মাগো—অভাগিনী মা আমার—আজ তোমার বুকের ধন অজ্ঞাত দেশে, অজ্ঞাত-নামা শত্রুর হস্তে নিহত হইয়া তোমারই নাম করিতে করিতে মহাপথে যাত্রা করিয়াছে—তুমি তো তা জানিতে পারিতেছ না। মা! কিন্তু—এ সংবাদ যখন লোকমুখে শুনিতে পাইবে, তখন—তখন তোমার দশা কি

হইবে—তুমি কেমন করিয়া প্রাণ ধরিবে মা! মা—মাগো—মা আঁমার—"

বলিতে বলিতে সোরাবের দুটী চক্ষু হইতে উৎসধারার মত প্রবলবেগে অশ্রুধারা বহিয়া বালু-বেলা সিক্ত করিয়া দিতে লাগিল। রুস্তাম চিত্রার্পিতের মত স্তব্ধভাবে নীরবে দাঁড়াইয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে সোরাব লোকের মুখে মিথ্যা পরিচয় পাইয়া আপনাকে তাঁহার পুত্র বলিয়া ভাবিতেছে। নহিলে কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া—তামিনা তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দিবে কেন, তাহাতে তাহার কি স্বার্থ থাকিতে পারে? তবুও সোরাবের প্রত্যেকটি কথা তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া তাঁহারও দুটী চক্ষে জল টানিয়া আনিতে ছাড়িল না। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুঃখে নিজের অজ্ঞাতে হৃদয়ে সহসা এমন একটুখানি সহানুভূতি জাগিয়া উঠিল যে, ক্ষণকাল একদৃষ্টে সোরাবের মুখের পানে চাহিয়া সহসা তিনি ভগ্নকণ্ঠে দুঃখের সহিত কহিলেন—

"সোরাব, তোমার মত পুত্র লাভ করিতে পারিলে রুস্তাম যে আপনাকে ভাগ্যবান ভাবিত এবং তোমাকে প্রাণের অধিক ভাল-বাসিত, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তুমি এক মহাভ্রমে পতিত হইয়াছ অথবা লোকে তোমাকে মিথ্যা পরিচয় শুনাইয়া রাখিয়াছে—তুমি রুস্তামের পুত্র নও। কারণ, রুস্তামের কেবলমাত্র একটি কন্যা ভিন্ন আর কোন সন্তান নাই, সে কন্যাও এখন তাহার মাতার কাছেই পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে—

রুস্তাম আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—বাধা পড়িল।

রুস্তামের তীক্ষ্ণধার ছোরা সোরাবের বুকে আমূল বিদ্ধ থাকিয়া বেদনা দিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাতনায় অধীর হইয়া রুস্তামের কথায় ক্রোধভরে বাধা দিয়া সে বলিয়া উঠিল—

"কে হে তুমি নির্ম্মম, অজ্ঞ বৃদ্ধ, আমার কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চাও? মৃত্যুপথযাত্রীর মুখ হইতে কখনও মিথ্যা বাহির হয় না, বিশেষ, জীবনে অদ্যাবধি আমি কখনও কোন কারণেই মিথ্যা বলি নাই—এ সময়ে আজ কিসের প্রলোভনে মিথ্যা বলিতে যাইব? প্রমাণ দেখিতে চাও? শুন বৃদ্ধ, আমার এই হাতে এখনও আমার পিতার প্রদত্ত পদক এবং মাতার প্রদত্ত আমার গৌরবময় পিতৃকুলের অপূর্ব্ব নিদর্শন চিহ্নিত আছে! দেখিতে চাও—বল—বল—"

সোরাব এমনভাবে উত্তেজিতস্বরে কথাগুলি বলিল যে—একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে রুস্তামের হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া যেন সহসা স্তব্ধ হইয়া পড়িল, মুখমণ্ডলের সমস্ত শোণিত যেন আচম্বিতে শুষ্ক হইয়া—বিকৃত—পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল, লৌহ বর্ম্মে আচ্ছাদিত দেহ একবার সবলে কাঁপিয়া লৌহাবরণগুলি ঝন্ ঝন্ করিয়া উঠিল, দেহের ভার বহনে অক্ষম হইয়া জানুদ্বয় সবলে পরস্পর আহত হইয়া থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কণ্ঠস্বরের সে শক্তি—সে সজীবতা যেন মুহূর্ত্তে তিরোহিত হইয়া গেল। যেন কোন্ সুদূর প্রদেশ হইতে প্রাণপণে চীৎকার করিয়াও অতি ক্ষীণ, অথচ উদ্বেলিতকণ্ঠে জবাব করিলেন—

"হাঁ—সো—রা—ব, সে তুই প্র—মা—ণ—কেউ অস্বীকার

করিতে পারিবে না। যদি তা' দেখাইতে পার, তা' হইলে যথার্থই তুমি রুস্তামের অজ্ঞাত পুত্র বটে।"

"এই দেখ—দেখ তবে,"

বলিয়া, সোরাব যাতনায় বিকৃতমুখে এক হাতের কনুইয়ের উপরে ভর করিয়া অতিকষ্টে ধীরে ধীরে পাশফিরিয়া অর্দ্ধোত্থিত-ভাবে একটু একটু করিয়া বাহুর আবরণ মোচন করিতে লাগিল। রুস্তাম ঠিক পাথরের প্রতিমূর্ত্তির মত, পলকশূন্য স্থির দৃষ্টিতে সেই দিকে স্তব্ধভাবে চাহিয়া রহিলেন। ক্রমে আবরণ সরাইয়া সোরাব বাহুদেশ উন্মুক্ত করিয়া দেখাইতে দেখাইতে কহিল—

"এই দেখ বৃদ্ধ, আমার পিতার প্রদত্ত আশ্চর্য্য-গুণসম্পন্ন মহা-শক্তিশালী পদক, এই দেখ ইহার পশ্চাতে তাঁহার নাম ও বংশপরিচয় খোদিত রহিয়াছে।"

বলিয়া অশেষ শ্রদ্ধাভরে ধীরে ধীরে পদকটি চুম্বন করিল। তারপর বাহুর উপরে অঙ্কিত, এক অতি সুস্পষ্ট, রক্তবর্ণে রঞ্জিত ক্ষুদ্র চিত্র-চিহ্ন দেখাইয়া গর্ব্বভরে কহিল—

"আর এই দেখ আমার পিতৃবংশের পরিচয়—অপূর্ব্ব 'গ্রিফিনের' চিত্র। মায়ের কাছে শুনিয়াছি আমার পূজ্যপাদ পিতামহ মহাবীর 'জাল' অতি শৈশবে এক পর্ব্বত-গহ্বরে পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন, ঐ 'গ্রিফিন' তাঁহাকে সেই পর্ব্বত গহ্বরে লালন-পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিল। তদবধি আমার পিতৃকুলের সকলের বাহুতেই, গৌরব ও সম্মানের নিদর্শন-

স্বরূপ, ঐ গ্রিফিনের চিত্র অঙ্কিত থাকে। শুনিয়াছি আমার শৈশবে মা স্বহস্তে আমার বাহুমূলে ঐ চিত্র অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন।”

বলিয়া, সোরাব ক্ষণকাল সজলনেত্রে সেই চিত্রের পানে চাহিয়া চাহিয়া অবশেষে রুস্তামের পানে ফিরিয়া কহিল—

“এখন বল, বৃদ্ধ, এ অপূর্ব্ব চিত্র জালের বংশধর ভিন্ন অন্য কাহারও বাহুমূলে অঙ্কিত দেখিয়াছ কি ? এখন কি তোমার সন্দেহ হয় যে আমি বীরবর রুস্তামের পুত্র নই ?”

কিন্তু, জবাব করিবে কে ? স্তব্ধ রুস্তামের পলকশূন্য অক্ষিতারকাদ্বয় যেন তাহাদের কোটর হইতে বাহির হইয়া পড়িয়া, এমন ভাবে সেই চিত্রের প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সোরাব দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। তার উপর রুস্তামের সেই—প্রাণশূন্যবৎ—চিত্রার্পিত অবস্থা দেখিয়া তাহার মনে যে কি হইল তা’ অন্তর্য্যামীই বলিতে পারেন। কিন্তু সেই দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া সহসা তাহার মুখমণ্ডল যেন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। দুই চোখে শ্রাবণের ধারার মত অশ্রুজল উথলিয়া উঠিয়া দরদর ধারায় বক্ষস্থল বাহিয়া ছুটিল। সে তাহা মুছিবারও চেষ্টা করিল না, সেই স্বচ্ছ বারিসমাকুল চক্ষুদ্বয়ের নির্নিমেষ ক্ষুধিত দৃষ্টি দিয়া সে যেন রুস্তামকে গ্রাস করিতে লাগিল। উভয়েই নীরব—উভয়েই স্তব্ধ—উভয়েই প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তিযুগলের মত স্পন্দহীন ! সে মুহূর্ত্তে কাহারও শ্বাসবায়ু বহিতেছিল কি না তাহা কে বলিবে !

সহসা রুস্তাম—যেন সর্পদষ্টের মত—অতি তীব্র অথচ করুণ-কণ্ঠে বিষম বিকৃত চীৎকার করিয়া কহিলেন—

"পুত্র—পুত্র—প্রাণাধিক—আমিই তোর—"

আর কথা সরিল না, মূর্চ্ছিত রুস্তামের বিরাট দেহ ছিন্নমূল কদলীর মত সহসা সোরাবের পার্শ্বে বালুবেলায় লুটাইয়া পড়িল।

সোরাবের দেহের যাতনা যেন মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া গেল, তাড়াতাড়ি পিতার মূর্চ্ছিত দেহের পার্শ্বে আপনার অশক্ত দেহকে সবলে টানিয়া লইয়া গিয়া দুই হাতে তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিল, তারপরে উচ্ছ্বসিত আবেগভরে ডাকিতে লাগিল—

"বাবা—বাবা—উঠুন—উঠুন"

রুস্তাম ধীরে ধীরে চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন, তারপর সোরাবের পানে চাহিয়া ভীষণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তাঁহার চোখের অর্থশূন্য অদ্ভুত চাহনি দেখিয়া সোরাবও ভয়ে শিহরিয়া উঠিল। কি বলিয়া—কেমন করিয়া যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবে ভাবিয়া পাইল না।

রুস্তাম আবার বিকৃতকণ্ঠে মর্ম্মন্তুদ যাতনায় চীৎকার করিয়া সহসা দুই হাতে মুঠা মুঠা করিয়া ধূলা লইয়া নিজের মস্তকে দিতে লাগিলেন—স্বহস্তে সবলে আপনার কেশ ও শ্মশ্রু ছিঁড়িতে লাগিলেন। সোরাব বিস্তর চেষ্টা করিয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিল। তখন রুস্তাম আর একবার বিকৃতকণ্ঠে বিকৃত আর্ত্তনাদ করিয়া সহসা আপনার সেই তীক্ষ্ণধার ছোরা তুলিয়া স্বহস্তে

আপনার বক্ষে বিদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সোরাব তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বিদ্যুতের মত চকিতে বাধা দিয়া কহিল—

"বাবা, বীর আপনি—স্ত্রীলোকের মত শোকে উন্মাদ হইবেন না—শান্ত হোন। আপনার সহিত আমার মূহূর্ত্তের পরিচয়, দম্‌কা বাতাসের মত আসিয়াছিলাম—ঘূর্ণীর মত পরক্ষণেই বিদায় হইয়া চলিলাম। এই ভাগ্যলিপি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই আমার অদৃষ্টপটে লিখিত হইয়াছিল—কার সাধ্য ইহার অন্যথা করিতে পারে? প্রথম দর্শনেই আমি আপনাকে চিনিয়াছিলাম—আমার হৃদয় ঠিক বলিয়া দিয়াছিল, কিন্তু নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা তাহা সফল হইতে দিল না। ইহাতে মানুষের হাত নাই—সে জন্য আক্ষেপ করিবেন না পিতা—"

বলিতে বলিতে সোরাবের কণ্ঠস্বর শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল। উত্তেজনাবশে দেহে যে টুকু শক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ অবসন্নতা আসিল, সে ধীরে ধীরে রুস্তামের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। রুস্তাম পাগলের মত আবেগভরে দুই হাতে তাহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।

রুস্তামের প্রিয় সহচর, যুদ্ধের চির অংশভাগী প্রাণাধিক অশ্ব 'রাক্‌স্' স্তব্ধভাবে একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া এতক্ষণ সেই দৃশ্য দেখিতেছিল। বন্য পশু হইলেও এই প্রভুভক্ত জীব—ঠিক মানুষের মতই—প্রভুর সুখ-দুঃখ, বিপদ-সম্পদ এমন অনুভব

করিতে পারিত যে তাহা আশ্চর্য্য! রুস্তামকে তেমন ভাবে শোক করিতে দেখিয়া সেই পশুর হৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল—তাহারও দুই চক্ষু হইতে ডাগর ডাগর জলের ফোঁটা টপ্ টপ্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, সে ধীরে ধীরে উভয়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল এবং একবার রুস্তামের ও একবার সোরাবের অঙ্গে আপনার নাক ঘসিয়া আপন হৃদয়ের বেদনা ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। রুস্তাম গভীর মনোবেদনায় করুণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

"হায় রাক্স্, তুই না আমার চির-বিশ্বস্ত বন্ধু—তুই না আমার সম্পদ-বিপদের নিত্য-সহচর? তুই যখন এই যুদ্ধক্ষেত্রে আমাকে পীঠে করিয়া আনিয়াছিলি—তখন তোর পাগুলা ভাঙ্গিয়া যায় নাই কেন? আজ কি তুই এই সর্ব্বনাশ সাধিবার জন্য উৎসাহ-ভরে আমাকে বহন করিয়াছিলি!"

রুস্তাম ঠিক পাগলের মত—অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার এক একটি কথা সোরাবের হৃদয়ে যেন শেলের মত বিঁধিয়া নিদারুণ যাতনা দিতে আরম্ভ করিল, অতি কষ্টে চোখের জল থামাইয়া রুস্তামের কথায় বাধা দিয়া সোরাব আগ্রহভরে বলিয়া উঠিল—

"এই কি আপনার সেই দেশবিখ্যাত অদ্বিতীয় ঘোড়া 'রাক্স্'! 'রাক্সের' নাম শুনে নাই—এমন লোক যে সমগ্র তুরাণের ভিতরে একটিও নাই! আয় 'রাক্স্', আমার কাছে আয়!"

ডাকিবামাত্র অশ্ব যেন তাহার মনের কথা বুঝিয়াই সোরাবের দেহের উপর মাথা নোয়াইয়া দাঁড়াইল। সোরাব তাহার মুখে ও কণ্ঠদেশে হাত বুলাইতে বুলাইতে স্নেহপূর্ণ কণ্ঠস্বরে কহিল—

মায়ের কাছে তোর অনেক গল্প—অনেক কীর্ত্তি-কাহিনীর কথা শুনিয়াছি, 'রাক্স্‌'! আমার অপেক্ষা তুই শত সহস্রগুণে অধিক ভাগ্যবান! আমি জীবনে যে পিতার ছায়া পর্য্যন্ত কখনও দেখিতে পাই নাই, তুই শৈশব হইতে আমার সেই পিতার পুণ্যময় ভবনে পালিত হইয়াছিস্‌, তুই আমার পরম স্নেহবান বৃদ্ধ পিতামহ বীরবর 'জালকে' দেখিয়াছিস্‌, তাঁহার হস্তে আহার করিয়াছিস্‌, আমার পিতার পরম স্নেহভাজন নিত্য-সহচর হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মত ফিরিয়াছিস্‌, তুই আমার পূজনীয় পিতৃব্যদের সঙ্গে খেলা করিয়াছিস্‌, সিস্তানের সকল নর-নারীর কাছে আদর পাইয়াছিস্‌, আমার পিতার ভবনে গর্ব্বের সহিত বাস করিয়াছিস্‌—তুই আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবান! আয় প্রিয় 'রাক্স্‌', একবার আমায় এ জন্মের মত বিদায়-চুম্বন দে।"

বলিতে বলিতে সোরাবের কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া দুটী চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রুপ্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মূক পশুর হৃদয়ও বেদনায় আলোড়িত হইয়া চোখ দিয়া হু হু করিয়া তপ্ত অশ্রুরাশি ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। 'রাক্স্‌' —ঠিক মানুষের মত করিয়াই—সোরাবের মুখের উপর

নিজের মুখ স্থাপন করিল। মানুষ ও পশুর চোখের জল একত্রে মিশিয়া অশ্রুজলের প্রবাহ ছুটিয়া চলিল। সেই পবিত্র অশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে সোরাব আবেগভরে পুনঃ পুনঃ অশ্বের মুখ চুম্বন করিতে লাগিল। সে মর্ম্মভেদী দৃশ্য রুস্তাম আর সহ্য করিতে পারিলেন না—ভগ্ন-করুণ-কণ্ঠে হৃদয়ভেদী আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন—

"পুত্র—পুত্র—হায় প্রাণাধিক জীবন-সর্ব্বস্ব আমার, আজ যদি ভাগ্যে বিপরীত ঘটিত, আজ যদি তোমার অস্ত্রে নিহত হইয়া এইখানে আমি ওই রকম করিয়া লুটাইতে পারিতাম, তা' হইলে আজ আমার মত ভাগ্যবান—আমার মত সুখী জগতে আর দ্বিতীয় থাকিত না! ওঃ—ঈশ্বর—ঈশ্বর! এখনো ওই বিশাল 'অক্সাস'-নদীর প্রবল বন্যা আসিয়া আমাকে গ্রাস করিতেছে না কেন? এখনও 'পামীর'-পর্ব্বতমালার ওই উচ্চ চূড়াগুলা এই পুত্রহন্তা পিশাচ-পিতার মস্তকে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে না কেন? এখনো বিরাট ভূমি-কম্পে মেদিনী বিদীর্ণ হইয়া আমাকে তার অন্ধকারময় ক্রোড়ে গ্রহণ করিতেছে না কেন? ওঃ—এ বেদনা কেমন করিয়া সহিব—এ জ্বালা কোথায় জুড়াইব! হা জগদীশ্বর, এ ভাগ্যহীনের সন্ত্বনা কোথায়—কোথায় শান্তি—আমার শান্তি কোথায় মিলিবে!"

"মিলিবে পিতা—শান্তি মিলিবে—অপেক্ষা করুন।"

বলিয়া সোরাব আকাশের পানে চাহিল। অস্তগামী

সূর্য্যের কণকরশ্মি তাহার মুখমণ্ডলে পড়িয়া সহসা এক অপূর্ব্ব দেবভাব ফুটাইয়া তুলিল। রুস্তাম মৃত্যুপথযাত্রী পুত্রের সেই শান্ত, গম্ভীর, স্তব্ধ মুখের পানে মুগ্ধনয়নে চাহিয়া রহিলেন। সোরাব ক্ষণকাল নীরবে আকাশপানে চাহিয়া গম্ভীরকণ্ঠে ধীরে ধীরে কহিল—

"জগতে কেহ উচ্চ নাম, উচ্চ সম্ভ্রম, উচ্চাসন গ্রহণ করিতে আসে, আবার কেহ বা চির-অজ্ঞাত—নগণ্য থাকিয়াই চলিয়া যায়, ইহা ভাগ্যের বিধান। আমি তেমনি থাকিয়াই চলিলাম। এ ভাগ্যলিপি খণ্ডন করিবার শক্তি মানুষের নাই। সে জন্য শোক করিবেন না পিতা! আমি চলিলাম, কিন্তু আপনার উচ্চকার্য্য এখনও বাকী আছে—ততদিন বুক বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিয়া থাকুন, তার পরে আপনার শান্তি মিলিবে। আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, আপনার সে দিনের আর অধিক বিলম্ব নাই। এই বাদশার মৃত্যুর পরে আপনারা সকল ওমরাহ মিলিয়া—নীল'আরাল হ্রদের' পরপারে তাঁহাকে কবর দিয়া ফিরিবেন—তার পরে আপনার শান্তি মিলিবে। ততদিন বুক বাঁধিয়া দৃঢ়-চিত্তে কার্য্য করিতে থাকুন। এ সময়ে বৃথা শোক করিয়া আমার অন্তিমের মুহূর্ত্তগুলি বিষাদ-ময় করিয়া দিবেন না পিতা—আপনার স্নেহমাখা হাসিমুখ দেখিয়া যাইতে দিন।"

সেই সন্ধ্যাচ্ছায়া-ধূসরিত মৃত্যুপথযাত্রীর মুখমণ্ডলে এবং কণ্ঠস্বরে এমন একটু কিছু ছিল যে রুস্তাম তাহার সেই

ভবিষ্যদ্বাণীতে সন্দেহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রবল শোকের প্রবাহ কে যেন সহসা বাঁধ দিয়া থামাইয়া দিল। বেদনাপূর্ণ—গম্ভীরস্বরে কহিলেন—

"তাই হউক পুত্র, তোমার কথা স্মরণ করিয়া আমি বুক বাঁধিয়া প্রতীক্ষা করিব—ঈশ্বর আমার হৃদয়ে বল দিন, তোমার যাত্রার পথ শান্তিময় করিয়া দিন।"

সোরাবের দেহের বল ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, কথা কহিবার শক্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হইতেছিল, সে মুহূর্ত্ত-কাল বিশ্রাম লইয়া পুনরায় শিথিল-কণ্ঠে কহিল—

"আর এক কথা পিতা! আমি চলিলাম, আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে—যাত্রার মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইতেছে, আমার আর একটা কথা রক্ষা করিবেন। আমার মৃত্যুর পরে আমার সেনাগণকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়া যাইতে দিবেন। তাহাদের কোন অপরাধ নাই। তাহারা আমাকে প্রাণতুল্য ভালবাসে বলিয়া আমারই অনুরোধে আমার সঙ্গে সঙ্গে এখানে প্রাণ দিতে আসিয়াছিল, তাহাদের এ কার্য্যের জন্য আমিই একমাত্র দায়ী, তাহাদের কোন অপরাধ নাই, তাহাদিগকে বন্ধুভাবে শান্তিতে দেশে ফিরিয়া যাইতে দিবেন।"

বলিতে বলিতে সোরাব হাঁফাইয়া পড়িল, রুস্তাম নীরবে চোখের জল মুছিয়া একদৃষ্টে তাহার পানে চাহিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া সোরাব আবার ভাঙ্গা ভাঙ্গা স্বরে বলিল—

"আর পিতা—আমার মা—আমার অভাগিনী মাতাকে আপনি মার্জ্জনা করিবেন। তিনি যে কেন আপনাকে—কন্যা জন্মিয়াছে বলিয়া—মিথ্যা সংবাদ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন, তা আমি যেমন জানি, তেমন আর কেউ জানে না। পুত্র হইয়াছে শুনিলে পাছে আপনি তাহাকে তাঁহার অঙ্কচ্যুত করিয়া কাড়িয়া লইয়া আসেন, কেবল সেই ভয়ে—সেই ভয়ে স্নেহময়ী জননী আমার আপনাকে মিথ্যা সংবাদ দিয়া ভুলাইয়া রাখিয়াছিলেন,—তাঁহাকে মার্জ্জনা করিবেন পিতা! আজ হতভাগিনীর সব ফুরাইল, এ সংবাদ পাইলে তিনি যে কি করিবেন তা' ভাবিতে এ সময়েও আমার বুক কাঁপিয়া উঠিতেছে। জগতে তাঁহার সান্ত্বনার স্থল—জুড়াইবার স্থল আর কিছু রহিল না। আপনি একবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবেন—প্রবোধ দিবেন, এ সময়ে একমাত্র আপনি ভিন্ন আর কেহ তাঁহাকে শান্ত করিতে পারিবে না। তাঁহাকে বলিবেন, যে শেষ মুহূর্ত্তে তাঁরই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলাম।"

বলিতে বলিতে জননীর মুখচ্ছবি মনে উদয় হইয়া আবার সোরাবের দুই চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। রুস্তামের চোখের জলও আর বাধা মানিল না—দ্বিগুণ বেগে উথলিয়া ছুটিল। সেই দিকে চাহিয়া সোরাব ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল, তার পর কষ্টে শ্বাস টানিতে টানিতে কহিল—

"আমায় কোলে নিন পিতা, আমাকে চুম্বন করুন—বিদায়—

সোরাবের মৃত্যু—৯৬ পৃষ্ঠা

বিদায় তবে ! আমাকে আপনার গৃহে লইয়া গিয়া পিতামহকে দেখাইবেন, আমাদের বংশের কবর-ভূমিতে কবর দিবেন এবং সেই কবরের উপরে খুব উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন, যেন বহুদূর হইতে লোকে তাহা দেখিতে পাইয়া বলে যে, ওইখানে বীরবর রুস্তামের প্রিয় পুত্র সোরাব ঘুমাইতেছে। আর—আর সেই সমাধিস্তম্ভ-মূলে আপনার চোখের পুণ্য অশ্রু ঢালিয়া আমার অস্থি শীতল করিবেন।”

রুস্তাম পাগলের মত দুই হাতে সোরাবকে জড়াইয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া লইয়া পুনঃ পুনঃ মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। সোরাবের বুকে বিদ্ধ ছোরাখানা অত্যন্ত যাতনা দিতেছিল, সোরাব অন্তিম-বলে তাহা টানিয়া তুলিয়া ফেলিল। সঙ্গে সঙ্গে হু হু করিয়া রক্তস্রোত বহিল। সোরাব একদৃষ্টে পিতার মুখের পানে চাহিয়া জন্মের শোধ শেষ উচ্চারণ করিল—

“বাবা—বাবা—বি—দা—য়—মা—”

---

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

### সমাপ্তি

সব ফুরাইল ; হতভাগ্য রুস্তামের চির-অজ্ঞাত বীরপুত্র বিদ্যুতের মত চকিতে দেখা দিয়া আবার বিদ্যুতের মত চকিতেই কোন্ চির-অজ্ঞাত দেশে চলিয়া গেল ! রুস্তাম

তাহার শবদেহ কোলে করিয়া পুতুলের মত নিশ্চল—নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন।

সূর্য্যদেব রণস্থলে রক্ত-রশ্মি ছড়াইয়া—সোরাবের রক্তাক্ত দেহ অস্বাভাবিক প্রভায় উজ্জ্বল করিয়া—সে দিনের মত পর্ব্বত শিখরের পশ্চাতে ঢলিয়া পড়িলেন। 'অক্সাস' নদীর সমতান কলস্বরে যেন দেবতাদের করুণ রোদন-সঙ্গীত বাজিতে লাগিল, বাতাসের হিল্লোলে যেন প্রেতকুলের দীর্ঘনিশ্বাস হা—হা করিয়া ফিরিতে লাগিল। অদূর প্রান্তরের প্রান্ত হইতে একটা তমসা উঠিয়া যেন সেই মর্ম্মভেদী শোকের দৃশ্য ঢাকিয়া দিবার জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। রুস্তাম তেমনি নীরব—নিস্পন্দভাবে বসিয়া রহিলেন।

দূরে দাঁড়াইয়া ইরাণী সৈন্যগণ একেবারে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে জয়োল্লাসে তাহারা মাতিয়া উঠিয়াছিল তাহা সহসা থামিয়া গেল। গভীর বিস্ময়ে একে অন্যের মুখের পানে চাহিতে লাগিল। কাহারও মুখে কথা সরিল না, অথচ রুস্তামের সেই ভাবান্তর দেখিয়া—সহসা ব্যাপারটা যে কি দাঁড়াইল, তাহা জানিবার জন্য সকলেই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল, তবুও হঠাৎ সে দিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে কাহারও যেন পা উঠিল না।

অবশেষে যখন কিছুক্ষণ সেই ভাবে কাটিয়া গেল, তবুও রুস্তাম ফিরিয়া আসিলেন না—অথচ নিহত তুরাণী যুবকের শবদেহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে উঠিতেও দেখা গেল না,

তখন কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় সকলেই অধীর হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার ভ্রাতা 'জহুর', 'গুডার্জ' প্রভৃতি জনকতক প্রধান ওম্‌রাহকে সঙ্গে লইয়া—সৈন্যগণকে পশ্চাতে আসিতে বলিয়া অগ্রসর হইয়া চলিলেন।

কিন্তু যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া যে দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল,—তাহাতে সকলেরই বাক্‌শক্তি নিমিষেই স্তব্ধ হইয়া গেল, সকলেরই হৃদয় যেন অজানিত আশঙ্কায় আলোড়িত হইয়া উঠিল। রুস্তাম পদশব্দে চকিত হইয়া মুখ ফিরাইয়া চাহিলেন এবং পরক্ষণেই এমন করুণকণ্ঠে বিকৃত চীৎকার করিয়া উঠিলেন যে, তাহার প্রতিধ্বনি বাতাসে ভাসিয়া আকাশের গায়ে গিয়া আঘাত করিল। তারপর সহসা বালকের মত ফুকারিয়া কাঁদিয়া আপনার দগ্ধ ভাগ্যের নিষ্ঠুর ইতিহাস বর্ণনা করিলেন।

তাঁহার ভ্রাতা জাহুর এবং গুডার্জ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, তাঁহার শোকে সকলেই বিষম শোকার্ত্ত হইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অজস্রধারে অশ্রুপ্রবাহ ঢালিয়া রণস্থলের রুধিরাক্ত বালুকা ধৌত করিতে লাগিলেন।

ক্রমে গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া আপনার কাল অঞ্চলখানি বিস্তার করিয়া বিশ্বপ্রকৃতিকে ঢাকিয়া দিতে লাগিল। তখন রুস্তাম হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে, সমবেত সকলকে কহিলেন—

"ইরাণ আর তুরাণের চির-বিবাদের আজ সমাপ্তি হইল। সৈন্যগণ, আজ হইতে তোমাদের অবসর—আর রুস্তামের জন্য

তরবারি ধরিতে হইবে না—এখন হইতে তোমরা নিশ্চিন্তে বিশ্রাম লাভ কর। তুরাণীগণকে নির্ব্বিবাদে দেশে ফিরিয়া যাইতে দাও—কেহ আর তাহাদিগকে শত্রু ভাবিও না। আজ আমার যে সর্ব্বনাশ হইল—তাহাদের সর্ব্বনাশও তাহার অপেক্ষা কম নহে, তুরাণীগণের যে ক্ষতি হইল তাহা আর কখনও পূর্ণ হইবে না। আজ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহারাও সমান শোকার্ত্ত—সমান অভিশপ্ত—সমান ক্ষতিগ্রস্ত! এই ঘোরতর অভিশাপ ও সর্ব্বনাশের ভিতরে আমাদের চিরশত্রুতা বিসর্জ্জন দিয়া আজ হইতে পরস্পরে বন্ধুত্ব করিলাম। যাও তুরাণী বীরগণ, যাও হতভাগ্য বন্ধুগণ, নির্ব্বিবাদে দেশে ফিরিয়া যাও—বাদশা 'আফ্রিজিয়াবের' কাছে গিয়া বল—তাঁহার সাম্রাজ্যের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ বীর—তাঁহার দেশের চির-গৌরবস্থল সোরাব তাহার অভিশপ্ত হতভাগ্য পিতার করে নিহত হইয়া সকল বিবাদের অবসান করিয়া দিয়া গিয়াছে।"

বলিয়া একবার আকাশের পানে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। সান্ধ্য আকাশের এক প্রান্ত হইতে একটা উজ্জ্বল প্রকাণ্ড তারকা রক্তবর্ণ তীব্র রশ্মি ছড়াইয়া তাঁহার পানে কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিয়া যেন তিরস্কার করিতেছিল। সেই দিকে চাহিয়া রুস্তাম সভয়ে কাঁপিয়া উঠিলেন, তারপরে নিঃশব্দে ধীরে ধীরে আপনার অঙ্গ-বস্ত্রে সোরাবের শবদেহ আচ্ছাদিত করিয়া, সাবধানে কাঁধে তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইরাণ ও তুরাণের সমবেত সৈন্যগণ নীরবে তাঁহার অনুসরণ করিল।

শিবিরে ফিরিয়া—পুত্র-শব স্কন্ধে—রুস্তাম আপনি দাঁড়াইয়া থাকিয়া, আদেশ দিয়া, নিজের শিবির এবং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম সমস্তই দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তারপরে তুরাণী সৈন্যগণকে বিদায় দিয়া—আপনার সেনাগণকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে জাবুলীস্থানে ফিরিয়া চলিলেন। ইরাণের কেহই বাধা দিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিল না।

গৃহে রুস্তামের বৃদ্ধ পিতা 'জাল' পুত্রের প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় পথ চাহিয়াছিলেন, যে দৃশ্য তাঁহার চোখে পড়িল তাহাতে বৃদ্ধের মর্ম্মান্তিক যাতনা হইতে লাগিল; সহসা যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—সমস্ত ব্যাপার ঠিক যেন স্বপ্নের খেলা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। রুস্তাম বৃদ্ধ পিতার ক্রোড়ে সোরাবের শবদেহ স্থাপন করিয়া মর্ম্মভেদী-স্বরে বলিয়া উঠিলেন—

"হায় পিতা, পুত্রহন্তা হইব বলিয়াই কি আপনার অসীম অপত্য-স্নেহে বর্দ্ধিত হইয়া অসামান্য যশ অর্জ্জন করিয়াছিলাম ?"

পিতা-পুত্র বহুক্ষণ ধরিয়া পরস্পর পরস্পরের গলা জড়াইয়া অশেষ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের শোকে সমস্ত জাবুলীস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা শোকে মগ্ন হইয়া গেল।

ক্রমে শোকের বেগ মন্দীভূত হইল, যথাসময়ে উপযুক্ত সমারোহে সোরাবের মৃতদেহ কবরস্থ করা হইল। রুস্তাম তাহার উপরে এক বহু উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া—ভিত্তি-গাত্রে পিতা-পুত্রের অদ্ভুত সমরের বিবরণ খোদিত করিয়া দিলেন,

তারপরে গৃহে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তিনি আবার 'রাকৃসে' আরোহণ করিয়া তামিনাকে দেখিবার জন্য যাত্রা করিলেন।

এদিকে তুরাণী-সৈন্যগণ দেশে ফিরিয়া গেল কিন্তু সোরাব ফিরিল না। তামিনা বিজয়ী পুত্রকে কোলে লইবার জন্য অধীর হৃদয়ে ছট্‌ফট্ করিতেছিলেন। কাজেই তাঁহার কাছে দুঃসংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে কেহই সাহস করিল না। কিন্তু অধিককাল তাহা চাপাও রহিল না। মায়ের প্রাণ আপনা হইতেই যেন সে সর্ব্বনাশের আঘ্রাণ পাইল—তামিনা পাগলিনীর মত ছুটিয়া পিতার কাছে সংবাদ জানিতে চলিলেন।

অবশেষে যখন সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িল তখন তামিনা সহসা বিকৃত আর্ত্তনাদ করিয়া সেই যে মূর্চ্ছিত হইলেন—সে মূর্চ্ছা সহজে ভাঙ্গিল না। বৃদ্ধ রাজা বহু চেষ্টার পরে যখন তাঁহার জ্ঞান ফিরাইয়া আনিলেন তখন তাঁহার নৈরাশ্যের ক্রন্দনে দেশের পশু-পক্ষী পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া নিরন্তর চোখের জল ঢালিতে লাগিল। সমস্ত দেশ জুড়িয়া কেবল করুণ রোদনের হাহা ধ্বনি বাজিতে লাগিল।

দিনের পর দিন গেল, সকলের শোক কমিয়া আসিল, কিন্তু তামিনার শোক কমিল না। সে ভীষণ শোক বাহির হইতে আপনার স্বরূপ গোপন করিয়া—তামিনার হৃদয়ের ভিতরে কঠিন তুষারের মত জমাট বাঁধিয়া বসিল। তামিনা আহার-নিদ্রা ভুলিলেন, ভোজন-ভ্রমণ ভুলিলেন, লোকের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত

বন্ধ করিয়া দিলেন। অহোরাত্রি কেবল আপনার ভিতরে আপনি মগ্ন হইয়া—মহাশোকের গভীরপারাবারে ভাসিতে লাগিলেন।

তাঁহার অবস্থা দেখিয়া সামানগানের সকলেই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল, নানা জনে নানা প্রকারে তাঁহাকে প্রকৃতিস্থ করিবার প্রয়াস পাইতে লাগিল, কিন্তু কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। ক্রমে তামিনার প্রকৃতিতে উন্মাদের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করিল—সকলেই মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে অত্যন্ত সন্তর্পণে চোখে চোখে রাখিতে লাগিল।

কিন্তু হায়, তাহাতেও ফল হইল না। একদিন সকলের অগোচরে পাগলিনী প্রাসাদে অগ্নি-সংযোগ করিয়া তাহার ভিতরে অবলীলাক্রমে বসিয়া রহিলেন।

হুহু করিয়া আগুণ জ্বলিল—চারিদিকে হৈহৈ পড়িয়া গেল—হাহাকারে ও আর্ত্তনাদে আকাশ-বাতাস কম্পিত হইতে লাগিল কিন্তু তামিনা সেই প্রজ্জ্বলিত প্রাসাদের ভিতরে স্থির—ধীর—অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন। কেহই তাঁহার রক্ষার কোন উপায় ভাবিয়া পাইল না।

তেমনি সময়ে রুস্তাম কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছিলেন। আকাশে উজ্জ্বল অনল-শিখা দেখিয়া এবং লোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া উন্মত্তবৎ দ্রুত যাইবার জন্য 'রাক্‌স্‌কে' ইঙ্গিত করিলেন। রাক্‌স্‌ প্রভুর ইঙ্গিত বুঝিয়া—ঠিক যেন পক্ষবিস্তার করিয়া—বায়ুবেগে ছুটিল এবং মুহূর্ত্তের ভিতরেই রুস্তামকে প্রজ্বলিত প্রাসাদের সম্মুখে আনিয়া দিল।

রুস্তাম চকিতের মত একবার ইতস্ততঃ চাহিলেন, পরক্ষণেই বিকৃতকণ্ঠে আকাশভেদী চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"তামিনা, দাঁড়াও, দাঁড়াও—আমি আসিয়াছি, একটু অপেক্ষা কর।"

বলিয়াই উন্মাদের মত সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিস্তূপের ভিতরে বিদ্যুদ্বেগে প্রবেশ করিলেন। সমবেত জনগণ দ্বিগুণ আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই রুস্তাম তামিনাকে দুই হাতে বুকে তুলিয়া লইয়া—বিদ্যুতের মতই চকিতে ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে ছিনাইয়া বাহির করিয়া আনিলেন।

তামিনার অঙ্গবস্ত্রে তখন পর্য্যন্ত আগুণ না ধরিলেও উত্তাপে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অঙ্গারের মত শুষ্ক ও কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। অপ্সরাসদৃশ সুন্দর মুখখানি কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তথাপি তাঁহার সে দিকে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। পতিকে দেখিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন—

"সোরাব—সোরাব—আমার সোরাবকে দেও।"

বলিয়াই তাঁহার পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সমবেত জনগণ মিলিয়া প্রাসাদের অগ্নি নির্ব্বাপিত করিল।

দিন কাটিল, আবার যেমন সংসার তেমনি চলিতে লাগিল, কিন্তু তামিনার হৃদয়ের ক্ষত পূরিল না—তাঁহার স্বাস্থ্যও ফিরিল না। ক্রমে অত্যল্প কালের ভিতরেই পুত্রহারা পাগলিনী ভগ্ন-হৃদয়ে—পতীর ক্রোড়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া—জীবনের পরপারে, বুঝি বা প্রিয়তম পুত্রের কাছেই চলিয়া গেলেন।

বুকভরা গভীর বেদনা বহন করিয়া হতভাগ্য রুস্তাম আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন।

কিন্তু সোরাবের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিতে অধিক দিন বিলম্ব হইল না। বাদশা 'কাইকুসের' মৃত্যু হইয়াছিল, তাঁহাকে আরাল-হ্রদের পরপারে কবরস্থ করিয়া ফিরিবার কালে তাঁহার ওমরাহগণ সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কেবল জীবিত ফিরিয়া আসিয়াছিলেন—রুস্তাম ও গুডার্জ। এক্ষণে রুস্তামেরও ডাক পড়িল।

রুস্তামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "সাওগাতের" জন্মকালে দূরদর্শী জ্যোতিষগণ কহিয়াছিলেন যে,—এই পুত্র জালের বংশের ধ্বংসকারী হইবে। সাওগাতের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার প্রকৃতিতে যখন সেই আশঙ্কার কারণ সকল ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, তখন সকলেই তাহার চিন্তায় অধীর হইয়া পড়িলেন। সাওগাতকে লইয়া যে কি করিবেন—বৃদ্ধ জাল সকলের সঙ্গে সেই পরামর্শ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সকলের যুক্তিমত তাহাকে কাবুলে পাঠাইয়া দিলেন।

রুস্তাম কাবুলের রাজাকে পরাস্ত করিয়া ইরাণের অধীন করিয়া লইয়াছিলেন, তদবধি কাবুলের রাজা কাইকুশকে রাজকর প্রদান করিতেন। রুস্তামের বাহুবলে ভীত কাবুলের রাজার নিকট সাওগাতের অনাদর বা অমর্য্যাদা হইবার আশঙ্কা ছিল না।

হইলও তাই। যুবক সাওগাত কাবুলে গিয়া অল্পদিনের ভিতরেই রাজার এমন প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন যে রাজা

সাওগাতের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে জামাতা করিয়া পরম সমাদরে রাখিলেন।

এ সংবাদ পাইয়া জাল, রুস্তাম ও তাঁহার অন্য ভ্রাতাগণের আনন্দের সীমা রহিল না, কিন্তু সাওগাত আপনার পিতা ও ভ্রাতাগণের উপরে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া রহিলেন। তাঁহারা যে তাঁহাকে কাবুলে নির্ব্বাসিত করিয়া রাখিয়াছেন—এ কথা তিনি কিছুতেই ভুলিতে পারিলেন না। তাহার উপর আবার কাবুলের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছে, বিশেষতঃ ভবিষ্যতে কাবুলের সিংহাসনে অরোহণ করিবার আশাও তাঁহার যথেষ্ট আছে। এরূপ স্থলে কাবুলের স্বাধীনতার বিষয় স্বতঃই তাঁহার মনে হইতে পারে। কিন্তু তাহার একমাত্র অন্তরায় রুস্তাম। কাজেই তিনি মনে মনে ভ্রাতার নিধন সাধনের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

বহুদিন হইতেই ইরাণের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইবার ইচ্ছা রাজার মনে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, কেবল সুযোগ অভাবে তাহা প্রকাশ করেন নাই। এক্ষণে সাওগাতের মনোভাব অবগত হইয়া তিনি অকপটে তাঁহাকে মনের কথা জানাইলেন। শ্বশুরের মনের কথা জানিতে পারিয়া সাওগাত যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, তৎক্ষণাৎ কহিলেন—

"চিন্তা নাই, আমি যা বলিব যদি করিতে পারেন তবে এইবারেই কাবুলে পারস্তবীর রুস্তামের কবর হইবে।"

রাজা আনন্দিত হইয়া কহিলেন—

"তুমি আমার জামাতা—পুত্রের সমান, আমার অবর্ত্তমানে এ সমস্ত তোমারই। কাবুলকে স্বাধীন করিতে পার—তুমিই ভবিষ্যতে তাহা ভোগ করিবে।"

"শুনুন তবে,"

বলিয়া সাওগাত অত্যন্ত সাবধানে নিম্নস্বরে কহিলেন—

"একটা ভোজ-সভার আয়োজন করুন, সেই সভায় আমি আপনাকে মন্দ বলিব, আপনিও আমাকে কটু কহিয়া তাড়াইয়া দিবেন। সভাসদেরা তাহা দেখিয়া সেই কথা দেশময় রাষ্ট্র করিয়া দিবে। আমি সিস্তানে গিয়া রুস্তামের কাছে আপনার নামে অভিযোগ করিব, তা হইলে রুস্তাম আপনাকে দমন করিতে আসিবেন। সেই সময়ে আপনি ক্ষমা চাহিয়া বন্ধুত্ব করিবেন এবং দিন কতক সমাদরে ভুলাইয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া শীকার করিতে যাত্রা করিবেন। ইতিমধ্যে বিশ্বস্ত অনুচরদিগকে আদেশ করুন যে—পথের একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে—ঠিক মৌচাকের মত—পাশাপাশি, গায়ে-গায়ে কতকগুলি গভীর গর্ত্ত করিয়া সেই সকল গর্ত্তে তীক্ষ্ণ বল্লম এবং তীক্ষ্ণ তরবারি প্রভৃতির ফলাগুলা উপরদিকে করিয়া পুতিয়া রাখুক, তারপরে গর্ত্তগুলার উপরে সরু সরু, হালকা ডাল-পালা ঢাকিয়া মাটী চাপা দিয়া রাখুক। আমি রুস্তামকে সেই পথে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব—আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবেন। রুস্তাম এই প্রাণঘাতী গর্ত্তের কথা জানিবে না—ঘোড়াশুদ্ধ সবলে গর্ত্তের ভিতরে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।"

পরদিন রাজবাটীতে এক বিরাট ভোজসভায় সমাগত বহু আমীর ওমরাহগণের সমক্ষে রাজার সহিত রাজার জামাতার কথায় কথায় হঠাৎ ঘোরতর বিবাদ হইয়া গেল। সাওগাত রাজাকে শাসাইয়া তৎক্ষণাৎ কাবুল পরিত্যাগ করিয়া সিস্তানে চলিয়া গেলেন।

রুস্তাম যখন ভ্রাতার প্রতি কাবুলের রাজার দুর্ব্যবহারের কথা শুনিলেন, তখন বিষম ক্রোধে তাঁহার দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল, প্রতিজ্ঞা করিয়া কহিলেন—

"চল ভাই, তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তোমাকে সেই রাজাসনে বসাইয়া আসিব। রুস্তামের ভ্রাতাকে জালের পুত্রকে অপমান করিয়া পৃথিবীতে কে বাঁচিয়া থাকিতে পারে ?"

বলিয়া, সৈন্যদল সঙ্গে লইয়া ভ্রাতার সহিত পরদিনই কাবুলে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা কাবুলে গিয়া পঁহুছিলেন, তখন সেই সংবাদ পাইয়া রাজা তাড়াতাড়ি বিনীত-ভাবে নগ্নপদে অগ্রসর হইয়া কর-যোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া লইলেন। উদার হৃদয় বীর রুস্তাম তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করিলেন এবং সকল ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া রাজার আগ্রহে রাজভবনে গিয়া অতিথি হইয়া রহিলেন। রাজার যত্নে ও সমাদরে রুস্তামের মনে কোন প্রকার সন্দেহ স্থান পাইল না।

এইভাবে দিনকতক কাটিয়া গেলে রাজা একদিন কথায় কথায় শীকারে যাইবার অভিপ্রায় জানাইলেন। শীকারের নামে বৃদ্ধ রুস্তামের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া যেন নাচিয়া উঠিল—

রাজার সঙ্গে শীকারে যাইবার জন্য তিনি ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। ক্রমে দিন স্থির হইল, শীকারে গমনের আয়োজন প্রস্তুত হইল, রাজা এবং সাওগাতের সহিত রুস্তাম শীকারে যাত্রা করিলেন। সাওগাত দক্ষিণ পার্শ্বে রাজাকে এবং বাম পার্শ্বে রুস্তামকে লইয়া পথ দেখাইয়া চলিলেন।

কিছুদূর সেইভাবে চলিয়া সকলে একটা বন্য প্রান্তরে গিয়া পড়িলেন। সাওগাত এবং রাজার ঘোড়া বেশ সমান-ভাবেই চলিয়া গেল। কিন্তু রুস্তাম যেখান দিয়া যাইতেছিলেন 'রাক্‌স্' আর সেখান দিয়া যাইতে চাহিল না। যেন কোন বিপদের আঘ্রাণ পাইয়া হঠাৎ থামিয়া পা ঠুকিয়া সেই বার্ত্তা জানাইতে চাহিল।

সাওগাত এবং রাজা তাঁহাকে ছাড়াইয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন, সুতরাং 'রাক্‌সের' সেই প্রকার আচরণে রুস্তাম অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন এবং তাড়াতাড়ি যাইবার জন্য মুখে ইঙ্গিত করিলেন। কিন্তু 'রাক্‌স্' মানিল না, সে বরং সে পথ ছাড়িয়া অন্য পথে চলিবার প্রয়াস পাইল। তাহাতে রুস্তাম অত্যন্ত রাগিয়া—জীবনে সর্ব্বপ্রথম তাহাকে জোরে কষাঘাত করিলেন। 'রাক্‌স্' দারুণ অভিমানে যেন পাগলের মত হইয়া পড়িল, এবং মোরিয়া হইয়া সেই পথেই রুস্তামকে লইয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। কিন্তু হায় বিশ হাত যাইতে না যাইতে ক্ষীণ চীৎকার করিয়া সশব্দে সবেগে একটা আচ্ছাদিত গর্ত্তের ভিতরে গিয়া পড়িল। গর্ত্তের ভিতরে রাশি রাশি বল্লম, ও

তরবারির তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ তাহার সর্ব্বাঙ্গে বিঁধিয়া বিষম বেদনা উপস্থিত করিল। রুস্তাম ও অক্ষত রহিলেন না— পার্শ্বের বল্লম ও তরবারি সকল তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিল। হায়, আর বুঝি তাঁহাদের রক্ষার উপায় নাই!

কিন্তু 'রাক্স্' পরক্ষণেই প্রভুর বিপদের অবস্থা বুঝিয়া চোখের পলকেই ভীষণ লাফে গর্ত্তের উপরে উঠিল। কিন্তু হায় দুরাচারেরা গর্ত্তগুলি মৌমাছির চাকের মত এমন ঘন ঘন পরস্পরের গায়ে গায়ে সংলগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল যে একটা হইতে উঠিতে না উঠিতে আবার আর একটার ভিতরে গিয়া পড়িল। প্রতিবারেই ভীষণ অস্ত্রাঘাতে অশ্ব ও আরোহীর সর্ব্বাঙ্গ অধিকতর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া রক্তের প্রস্রবণ ছুটিল এবং প্রতিবারেই রাক্সের সঙ্গে সঙ্গে রুস্তামের জীবন প্রবাহ অনন্তের দিকে ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতে লাগিল। তখন আর রুস্তামের বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাঁহাদের বংশের ধ্বংসকারী সাওগাত কর্ত্তৃকই তাঁহার মৃত্যুর জন্য সেই ভীষণ মৃত্যুর জাল বিস্তৃত হইয়াছে! তখন একদিকে সাওগাতের প্রতি যেমন ক্রোধ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, অন্যদিকে তেমনি 'রাক্সের' প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতাপে হৃদয় ভরিয়া উঠিল।

এইরূপে ক্রমাগত ছয়বার সেই ভীষণ মৃত্যু কূপে পড়িয়া ও উঠিয়া 'রাক্সের' সকল শক্তি শেষ হইয়া গেল, রুস্তামও মৃত্যুর তীরে আসিয়া শেষ নিঃশ্বাসের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যখন সপ্তম বার রাকৃস্ প্রভুকে পৃষ্ঠে লইয়া পার্শ্ববর্ত্তী আর এক কূপে পতিত হইল তখন তাহার দেহে আর কিছুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট ছিল না। তবুও অন্তিম চেষ্টায় সম্মুখের পদদ্বয় কূপের মুখে তুলিয়া ধরিল। তখন অল্পদূরে রাজার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া পিশাচ সাওগাত মনের আনন্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

উপর্য্যুপরি সহস্র সহস্র ক্ষতে ও বর্ষার বারিধারার মত রক্তস্রাবে শেষের মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছিল, রুস্তাম অতি কষ্টে হাতছানি দিয়া ভ্রাতাকে নিকটে আসিতে আহ্বান করিলেন। রুস্তাম হইতে তখন আর কোন ভয়ের কারণ নাই মনে করিয়া সাওগাত কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তখন রুস্তাম করুণ কণ্ঠে কহিলেন—"নিজের ভাই হইয়া এমন নৃশংস ভাবে আমাকে হত্যা করিলে সাওগাত!"

সাওগাত ঈর্ষার হাসি হাসিয়া জবাব করিলেন—

"এ জগতে তুমি বহু রক্তপাত করিয়াছ, সেই সকল ব্যক্তির প্রেতাত্মা তোমার রক্ত পানের আশায় অধীর হইয়া উঠিয়াছে, আমি কি করিব বল? এ ঈশ্বরের বিধান—এই ভীষণ রক্ত-প্রবাহের ভিতরে তুমি মরিবে—হাঃ—হাঃ—!"

রুস্তাম ঘৃণাভরে মুখ বিকৃত করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"আমার এই হাতে বহু রাজা বাদশা নিহত হইয়াছে, তথাপি এই মৃত্যুকালেও আমার সেই বাহু তেমনি অজেয় রহিল—ইহাই আমার তৃপ্তি! কিন্তু কাপুরুষ! সতর্ক হও; আমার মৃত্যু বার্ত্তা শুনিয়া যখন 'ফারমার্জ' বিশাল বাহিনীসহ

প্রতিকার করিতে আসিবে তখন কোথায় লুকাইবে তাহার উপায় চিন্তা কর। ভাই, একটা অনুরোধ রক্ষা কর। এই নিরাশ্রয় অবস্থায় শকুনি-গৃধিনী-শিয়াল-কুকুর আসিয়া আমার মৃত দেহ না ভক্ষণ করে সেই জন্য একটা ভিক্ষা চাহিতেছি। আমার তীর ধনু উপরে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে—দয়া করিয়া আনিয়া দিবে না ভাই ?"

এই শেষ অনুরোধ সাওগাত উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, রুস্তামের তীর ধনুক খুঁজিয়া আনিয়া তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। কিন্তু সহসা রুস্তামের চক্ষুদ্বয় যেন জ্বলিয়া উঠিল—মুখমণ্ডলে তাঁহার পূর্ব্বের তেজ ফুটিয়া উঠিল। রুস্তাম সজোরে তাঁহার হাত হইতে তীর ধনু টানিয়া লইলেন, ভয়ে সাওগাতের মুখ শুকাইল, বিদ্যুতের মত চকিতে ছুটিয়া তিনি একটা গাছের পশ্চাতে লুকাইলেন।

রুস্তাম একবার উচ্চহাসি হাসিয়া জীবনে সর্ব্বশেষ বার ধনুকে শর যোজনা করিয়া সেই দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই ভীষণ তীক্ষ্ণ তীর বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া বৃক্ষ ভেদ করিয়া সাওগাতের বক্ষস্থল বিদ্ধ করিল। মর্ম্মান্তিক চীৎকার করিয়া সাওগাত তৎক্ষণাৎ মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

রুস্তাম একবার আকাশের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"ধন্য জগদীশ্বর—আর আমার আক্ষেপ নাই।" তারপরেই তাঁহার হস্তের মুষ্টি শিথিল হইল, তিনি ধীরে ধীরে মহানিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন।

সমাপ্ত